সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জুন ২০২৩

বিশ্বযোগে যেথায় আমরা

হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ২১ জুন ২০২৩-এ সফররত ভারতীয় নৌ জাহাজ আইএনএস কিলতানে একটি অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। ভারতীয় ও বাংলাদেশি নৌবাহিনীর সদস্যগণ এবং চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। হাই কমিশনার ভারত-বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান গভীরতার নিদর্শন হিসেবে এই নিয়মিত নৌ জাহাজ পরিদর্শনসমূহের প্রশংসা করেন। পরবর্তীতে, ২২ জুন, হাই কমিশনার আইএনএস কিলতানের কমান্ডিং অফিসার কমান্ডার অরিজিত পান্ডের সঙ্গে চট্টগ্রাম কমনওয়েলথ ওয়্যার সিমেট্রিতে সমাহিত সৈন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ভারতীয় নৌবাহিনী ও বাংলাদেশি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ ২১ জুন ২০২৩-এ চট্টগ্রাম বন্দরে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করেছে। উভয় দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য একটি যোগব্যায়াম সেশন আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরীকে ১৫০টি যোগ ম্যাট উপহার দেন।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫১ | সংখ্যা ০৬ | জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩০ | জুন ২০২৩

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

অরবিন্দ চক্রবর্তী
সম্পাদক
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২
মোবাইল : +৮৮০১৮৫২০৪৬০২৮
e-mail : inf2.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিকস শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত
ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত
লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই।
এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রবিন্দু
রাজস্থান

‘রাজস্থান’ শব্দের অর্থ–‘Land Of Kings’ অর্থাৎ ‘রাজার ভূমি’। এটি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। আয়তনের দিক থেকে ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য। মরুভূমিতে ঘেরা এই জায়গায় বহু বছর আগে রাজপুতরা বসবাস করত। যার জন্য এই এলাকার নাম ছিল ‘রাজপুতানা’।

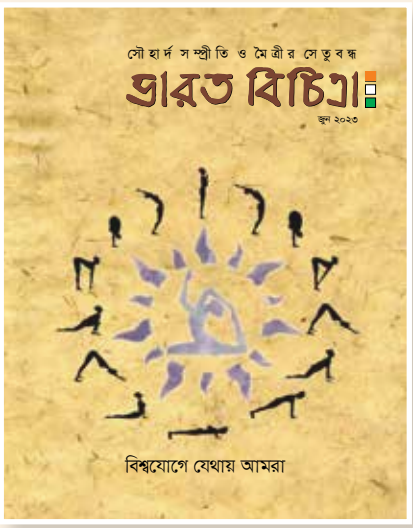

সূচিপত্র

প্রচ্ছদরচনা	ইয়োগা : বিশ্বযোগে যেথায় আমরা ॥ দেবযানী বসু	০৪
দুর্লভ	পাণ্ডুলিপি থেকে জীবনানন্দ দাশের নতুন কবিতা ফয়জুল লতিফ চৌধুরী	০৭
প্রবন্ধ	বাঙালির আত্মশক্তি ও একজন কলিম খান ॥ স্বরলিপি নবারুণ ভট্টাচার্যের আখ্যান ॥ ঋভু চট্টোপাধ্যায়	১০ ১৩
জন্মশতবর্ষ	শতবর্ষে গৌরকিশোর ঘোষ ॥ ঈশিতা ভাদুড়ী	১৬
মলায়লম ছোটগল্প	অন্য গ্রীষ্ম ॥ ই সন্তোষ কুমার ॥ অনুবাদ : তৃষ্ণা বসাক	১৯
অনূদিত কবিতা	কাইফি আজমির দুটি কবিতা ॥ উর্দু থেকে অনুবাদ : সফিকুন্নবী সামাদী	২২
পঙ্‌ক্তিমালা	রবীন্দ্র গোপ ॥ পাশা খন্দকার ॥ রঞ্জন মৈত্র ॥ বিশ্বজিৎ মণ্ডল মামুন মুস্তাফা ॥ আদিত্য নজরুল ॥ রুমা ঢ্যাং অধিকারী শুভাশিস সিনহা ॥ অজয় রায় ॥ তাপস চক্রবর্তী ॥ মাহফুজা অনন্যা রঞ্জনা ভট্টাচার্য ॥ মাহফুজ রিপন ॥ সৌম্য সালেক	২৪-২৫
ছোটগল্প	দিকচিহ্ন রেখে যায় যে ধ্রুবতারা ॥ কাজী রাফি	২৬
সাক্ষাৎকার	দেশভাগের ফলে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেলাম ॥ সেলিনা হোসেন	৩০
ধারাবাহিক উপন্যাস	বকেয়া হিসেব ॥ শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩
কেন্দ্রবিন্দু	রাজপুতানার রাজস্থান ॥ রোদ্দুর চয়ন	৩৬
ফিলাটেলি	ভারতীয় ডাকটিকিটে চলচ্চিত্র ॥ নিজাম বিশ্বাস	৪০
নিবন্ধ	ভক্ত-ভগবানের মিলনোৎসব ॥ সরস্বতী রানী পাল	৪৫
শেষ পাতা	প্রথা ভাঙ্গার কবি প্রভাত চৌধুরী ॥ রাহুল গাঙ্গুলী	৪৮

বসুধৈব কুটুম্বকমের জন্য যোগ

ভারতীয় হাই কমিশন ২১ জুন ২০২৩-এ ঢাকায় বাংলাদেশের যোগব্যায়ামপ্রেমীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন করেছে। এই আয়োজনে বিশাল জনসমাগম ঘটে, যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের অংশগ্রহণকারীগণ ভারতে উদ্ভূত যোগের প্রাচীন এই কলাকৌশল উদ্‌যাপন করতে একত্রিত হয়েছিলেন। এই বছরের যোগ দিবস উদ্‌যাপনের মূল সুর হলো 'বসুধৈব কুটুম্বকমের জন্য যোগ'- যার অর্থ 'সমগ্র বিশ্ব একটি পরিবার', যা এই বছর ভারতের জি২০-র প্রেসিডেন্সির সঙ্গে গভীরভাবে অনুরণন ঘটায়। হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা তাঁর বক্তব্যে আধুনিক বিশ্বের কাছে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার অনন্য অবদান হিসেবে যোগের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি যোগকে ভারত ও বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বর্ণনা করেন যা দেশ দুটির মাঝে বন্ধুত্ব ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের গভীর বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে, পাশাপাশি আমাদের জনগণের সামগ্রিক কল্যাণকেও উৎসাহিত করে। এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় যোগ বিশেষজ্ঞের অনুশীলন প্রদর্শিত হয়।

সম্পাদকীয়

'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম'–অর্থাৎ শরীর মন সুস্থ না থাকলে জাগতিক বা পারমার্থিক কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন সম্ভব নয়। যোগ (সংস্কৃত, পালি : যোগ yóga) ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্ভূত একপ্রকার ঐতিহ্যবাহী শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক সাধনপ্রণালী। 'যোগ' শব্দটির দ্বারা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ধ্যানসাধনাকেও বোঝায়। আধুনিক যুগে সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো সম্মেলনে যোগের কথা তুলে ধরবার পর যোগসাধনা বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে। পরবর্তীতে ভারত সরকার ২১ জুন 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' ঘোষণা করে।

২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগানুশীলনের উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা গড়ে তোলার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভারতীয় মিশনে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়ে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এ বিষয়ে নানা উৎসাহমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত করছেন। এই বছর ২০২৩ এ তিনি যোগদিবস পালন করেছেন আমন্ত্রিত বৈদেশিক ডেলিগেটসদের সঙ্গে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও যোগশিক্ষা প্রবর্তনের নানা কর্মসূচি নিয়েছেন ও উদ্‌যাপন করেছেন। বিশ্বের বহু খ্যাতনামা যোগগুরু আন্তর্জাতিক মহলে যোগের এই স্বীকৃতির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। চলতি বছরেও যোগের আয়োজন ছিল মনোগ্রাহী। যোগব্যায়াম সুষ্ঠু ও নীরোগ জীবনযাপনের বিশেষ পন্থা। কথায় বলে 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'। ব্যস্ত আর জটিল আধুনিক জীবনে তাই যোগব্যায়াম হয়ে উঠেছে প্রাত্যহিক যাপনের অংশ। গবেষণায় প্রমাণিত যাঁরা নিয়মিত যোগব্যায়াম করেন, তাঁদের মনের শক্তি এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। অভ্যাস বা প্রাণায়াম ও মেডিটেশন এ দুটিই যোগব্যায়ামের অপরিহার্য অংশ। এছাড়া শরীরের ভারসাম্য, সক্ষমতা ও স্থিতিস্থাপকতা অটুট রাখা, ব্যথাবেদনা নিরাময়, অনিদ্রামুক্ত জীবন, অতিরিক্ত ওজন হ্রাস, মানসিক চাপ কমানো ও মনোসংযোগ বাড়াতে পৃথিবীতে যোগাসনের বিকল্প আছে বলে জানা নেই। বর্তমানে তাই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য যোগসাধনার পক্ষে মত প্রদান করছেন। প্রাচীন আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাথে যোগের কিছু যোগসূত্র রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তবে কী সংযোগ তা ভালোভাবে বোঝা যায় না। বছরের পর বছর ধরে ইতিহাসবিদ, নৃবিজ্ঞানী এবং যোগের অনুশীলনকারীদের মধ্যে এর উৎস সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন এবং তর্কবিতর্ক রয়েছে।

যোগের উৎস উপাদানগুলোর বেশিরভাগ ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। তবুও সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বজুড়ে যোগের প্রতি আগ্রহের কারণে ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক পণ্ডিত এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে মনোনিবেশ করতে শুরু করেছেন। ঐতিহাসিক সূত্র ও প্রমাণগুলো ইঙ্গিত করে যে, সিন্ধু উপত্যকায় আজ থেকে ৩৫০০ বছর পূর্বে গড়ে ওঠা সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতায় যোগসাধনা বিকাশ লাভ করেছিল।

বিচিত্র বিষয়সমৃদ্ধ এ সংখ্যায় প্রতিবারের মতো নিয়মিত বিভাগ থাকছে।

সকলের মঙ্গল হোক।

ইয়োগা : বিশ্বযোগে যেথায় আমরা

দেবযানী বসু

প্রচ্ছদরচনা

বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, জলদূষণ, মাটিদূষণ, খাদ্যদূষণ কী না নিয়ে বেঁচে আছি আমরা তথা সারা পৃথিবীর মানুষ। আমি ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। আমার প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ দুটি যমজ অস্তিত্ব। বাঙালি আমাদের পরিচয়। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে দেখছি শরীর চর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশ্বশ্রী মনোহর আইচ, ভারতীয় বডিবিল্ডার মনোতোষ রায়, শ্রী যতীন্দ্রনাথ গুহ (গোবর গুহ), বাংলাদেশের জাহিদ হাসান শুভ–এদের কথা মনে পড়ে যায় লেখার প্রারম্ভে। বাংলার ঘরে ঘরে শরীর চর্চার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল সেই স্বদেশী আমল থেকে। ব্রতচারীখেলা, লাঠিখেলা, কুস্তি সবকিছুই ছিল। ছিল যোগাসন, যোগব্যায়াম অনুশীলন কেন্দ্র। এখন জিমখানা, সুইমিং পুল ছাড়া বহুতল আবাসনের কোনো দাম নেই। এই প্রবন্ধটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। আমি আমার বাবাকে শরীরচর্চা করতে দেখেছি। তিনি ডনবৈঠক দিতেন, ডাম্বেল নাচাতেন, লাঠিখেলা ঘোরাতেন, যোগব্যায়াম করতেন। আমাদের উৎসাহ দিতেন। উনিশ বছর বয়সে আমিও ব্যায়াম করা শুরু করলাম

এরপরে সংসারযুদ্ধে সারাজীবন ধরেই ধরা-ছাড়া চলেছে। যাই হোক আমার পরোক্ষ গুরুদেব ছিলেন স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী পদ্মভূষণ বরাহনগর, শ্রী নীলমনি দাস আয়রন ম্যান ও প্রত্যক্ষ গুরু ব্যায়ামবিদ চিকিৎসক শ্রী অমর নন্দী (রবীন্দ্রসদন এক্সাইড বিল্ডিংয়ে ছিল অফিস)। কমবয়সে আমার সঙ্গী ছিল শিবানন্দ সরস্বতীর *যোগবলে রোগারোগ্য* ও নীলমনি দাসের *মেয়েদের সচিত্র ব্যায়াম ও সৌন্দর্য* নামের দুটি বই।

মানুষের জীবনে সেই প্রাচীন কাল থেকেই অন্যতম সাধনা হলো কীভাবে সুদীর্ঘ কাল ধরে যৌবন ধরে রাখব, সুস্থ নীরোগ থাকব, দীর্ঘায়িত হবে আয়ু। আমরা জানি প্রাচীন ভারতে মুনি ঋষিরা এই যোগাসনের সাহায্যে নিজেকে কর্মঠ সবল রাখতেন। ভগবানের আরাধনা তপস্যা করতেন। *হঠযোগ প্রদীপিকা* চিরপরিচিত একটি বইয়ের নাম। তাঁরাই আবিষ্কার করেছিলেন এই দেহ ও মনের রহস্য। বস্তুত নিজ চৈতন্যকে অসীম সৌন্দর্য ও স্থিতপ্রাজ্ঞতায় উন্নীত করা, দার্শনিক মেধা ও আত্মানং বিদ্ধির অত্যুগ্র বাসনায়, ভগবানের সামীপ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় এইসব ঋষিশ্রেষ্ঠরা যা লিখেছেন, যা করেছেন তা বহুজনহিতায় আজ কাজে লাগছে।

এই বিশ্বায়নের যুগে উইকিপিডিয়া খুললে যোগ কী তা জানছি। যোগ (সংস্কৃত, পালি : योग yóga) ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্ভূত এক প্রকার ঐতিহ্যবাহী শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক সাধনপ্রণালী। [১] 'যোগ' শব্দটির দ্বারা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ধ্যানপ্রণালীকেও বোঝায়। [২][৩][৪] হিন্দুধর্মে এটি হিন্দু দর্শনের ছয়টি প্রাচীনতম (আস্তিক) শাখার অন্যতম। [৫][৬] জৈনধর্মে যোগ মানসিক, বাচিক ও শারীরবৃত্তীয় কিছু প্রক্রিয়ার সমষ্টি।

হিন্দু দর্শনে যোগের প্রধান শাখাগুলি হলো রাজযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও হঠযোগ। [৭][৮][৯] ভারতীয় দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতে, পতঞ্জলির যোগসূত্রে যে যোগের উল্লেখ আছে, তা হিন্দু দর্শনের ছয়টি প্রধান শাখার অন্যতম (অন্যান্য শাখাগুলি হলো কপিলের সাংখ্য, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনীর পূর্ব মীমাংসা ও বদরায়ানের উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত)। [১০] এছাড়াও উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা, হঠযোগ প্রদীপিকা, শিবসংহিতা ও বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে যোগ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যোগ বিষয়ে উল্লিখিত পুরোনো গ্রন্থসমূহ থেকে এর সময়ক্রম সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। কিছু গ্রন্থ যেমন হিন্দুদের উপনিষদ [১১] বা বৌদ্ধধর্মের [১২] পালি ভাষায় লেখা কতিপয় ধর্মশাস্ত্রে যোগের বিষয়ে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। পতঞ্জলি যোগসূত্রসমূহ খ্রিষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশ বছরের ভিতরে লেখা হয়েছিল [১৩] যদিও বিংশ শতকে এটি প্রসারতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। খ্রিষ্টিয় ১১ শতকে হঠযোগের পুথিসমূহের আবির্ভাব হয়েছিল তান্ত্রিক পন্থা থেকে। [১৪][১৫]

স্বামী বিবেকানন্দের সফলতার পর, উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকে বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের যোগাচার্যগণ পশ্চিমা দেশসমূহে যোগবিদ্যার প্রচার করেন। [১৫] ১৯৮০-র দশকে পাশ্চাত্য দেশসমূহে এটি শরীরচর্চার অঙ্গ হিসেবে জনপ্রিয় হয়। অবশ্য ভারতীয় পরম্পরায় যোগকে কেবল এক শরীরচর্চার অঙ্গ মাত্র জ্ঞান করা হয় না, এর একটি আধ্যাত্মিক এবং ধ্যানের প্রাণতা আছে বলে বিবেচনা করা হয়। [১৬] তদুপরি, সাংখ্য দর্শনের সাথে বহু মিল থাকা যোগ হলো হিন্দুধর্মের ছয়টি মূল দর্শনের একটি, যার নিজেরই এক মীমাংসা প্রণালী (epistemology) এবং তত্ত্ব (metaphysics) আছে। [১৭]

কর্কটরোগ, স্কিৎজোফ্রেনিয়া, হাঁপানি, হৃদরোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যোগের সুফলতার বিষয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। এসব পরীক্ষাসমূহের ফলাফল এখনো স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। [১৮] [১৯] অন্যদিকে, কর্কটরোগের ক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, যোগাভ্যাস করার ফলে কর্কটরোগ হওয়ার প্রবণতা কমে যায় এবং কর্কটরোগীর মনস্তাত্ত্বিকভাবে রোগ নিরাময় করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

এই যে আমি এই জ্ঞানমূলক সারবস্তুটি তুলে দিলাম তা শুধু রোগ কীভাবে কী অবস্থায় গৃহীত হচ্ছে আমাদের দ্বারা এটুকু বোঝানোর জন্য।

বর্তমান সময়ে ইন্সটাগ্রাম, টুইট, ফেসবুক কোথায় না শরীর চর্চা করা চলছে। এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার চীন, জাপান, কোরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা সবাই ব্যস্ত ব্যায়াম অনুশীলনে। বলা হয় যে যোগব্যায়ামের কোনো প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। জিমন্যাস্টিকের প্রতিযোগিতা হয় হোক। চীন প্রতিবার বেশিরভাগ সোনা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আমরা দর্শক শুধু। প্রতিযোগিতা নেই। পয়সা নেই। মানে ডলার নেই। তাই কি? তবে অনলাইন যোগা কম্পিটিশন হয়। যোগব্যায়াম এখন ব্যবসায়িক দিক দিয়ে সফল হয়ে উঠছে। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, আমেরিকান এসোসিয়েশন ওয়ার্ল্ড কাপ কতো আয়োজন!! একসময়ে ভগবানকে লাভের উদ্দেশে যা তৈরি হয়েছিল হাজার হাজার শতাব্দী পেরিয়ে তা নিখুঁতভাবে স্পোর্টসম্যানশিপ তৈরি করে নিয়েছে। শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং–শুধু এই ব্যাপারটাতে আমরা আটকে থাকছি না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় বৈদেশিক যোগগুরু বিক্রমের কথা। তিনি আবার যৌনতাঘটিত বিতর্কিত গুরু। মানুষ তো আনন্দ খুঁজবেই। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষার পর জীবনকে উপভোগ করতে চাইবে। কিছু কিছু চ্যানেলে যোগাসন উপস্থাপন করার পদ্ধতিতে যৌন আবেদন মিশে থাকে। অনেকটা শরীর প্রদর্শনের উন্মুক্ত আবহাওয়া আছে। আমি খারাপ বলছি না। জীবন তো এরকম হবেই। আমাদের বাউল সম্প্রদায়ের দেহ সাধনা, খাজুরাহের যোগমাধ্যমে যৌনক্রিয়া কী না নেই এই ভারতীয় সংস্কৃতিতে।

যোগব্যায়াম বা যোগাসন শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। ফিট থাকতে চিকিৎসকরাও যোগাব্যায়ামের পরামর্শ দেন। তবে যোগব্যায়ামের ক্ষেত্রে কোনোরকম ভুল পদক্ষেপ নিলে, বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই কিছু ব্যাপারে সতর্কতা জরুরি। সেইজন্য ট্রেনার দরকার হয়। কিছু বছর গুরুর কাছে, ব্যায়াম সমিতিতে অভ্যাস করার পর নিজে নিজে করা যায়। নিজের শরীরের স্থিতিস্থাপকতা বুঝে করা যায়। অত ভয় পাবারও কিছু নেই। হয়তো একটু বেশি মোচড় লেগে গেল তখন ডেইলি অভ্যাস বন্ধ রেখে ওষুধ ও মালিশ ইত্যাদি করে সারিয়ে নিয়ে আবার শুরু করা যায়। দুয়েকবার যে এরকম ঘটেনি আমার তা নয়

তবে সেটা নগণ্য।

শরীরম খলু ব্যাধি মন্দিরং। তাই শুধু হাত পা বেঁকিয়ে চুরিয়ে ব্যায়াম দেখালেই হবে না। আসলে তো শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের ব্রেইনের উন্নতি হবে। আজ প্রতিটি প্রখ্যাত বিখ্যাত বিদ্যালয়ে যোগশিক্ষক থাকেন। আবার ক্যারাটে, সাঁতার শিক্ষকও থাকেন। যোগাসনের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা প্রাণায়াম ভ্রমণ প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদি করানো হয়। যে কোনো আসন পূর্ণ মাত্রায় করার আগে স্ট্রেচিং, ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে হয়। খুব তাড়াহুড়ো করে শেখার জিনিস এ নয়। যথেষ্ট ধৈর্য ও শান্তশীল, সহনশীল হতে হয়। হাতে গরম ফলাফল পাওয়ার কথা চিন্তা করলে হবে না।

নেদারল্যান্ডসের সিদ্ধপুরুষ উইম হফ একজন ডাচ পর্বতারোহী। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন প্রাচীনতম ভারতবর্ষীয় এইসব ব্রিদিং টেকনিক তাকে বিশ্ববিখ্যাত করে তুলেছে। একাকিত্ব, ডিপ্রেসন, মেলানকোলি, মানসিক চঞ্চলতা সব দূরে যাবে প্রাণায়াম অভ্যাসে। প্রাকটিস মেকস আ ম্যান পারফেক্ট। উইম হফকে শতকোটি প্রণাম। যোগ চিকিৎসাশাস্ত্র যা আমরা অর্থাৎ একবারে সাধারণ ভারতবাসীরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি তার মূল্য বুঝতে মিলেনিয়াম পেরিয়ে গেলাম।

একবার শুনেছিলাম ওঁ মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে মনকে কেন্দ্রীকরণের চেষ্টা করা হয় এর মাধ্যমে খ্রিষ্টানরা নাকি হিন্দু হয়ে যাচ্ছে। যোগগুরু বিক্রম সে সব বালখিল্য অভিযোগ সামলেছিলেন। হিন্দু ধর্মের ঋষিরা এর প্রবর্তক হলেও যেকোনো ধর্মের লোক যোগচর্চা করতে পারে। যাদের বিশ্বাস এই পথে ঈশ্বরলাভ হবে তারা সেভাবেই করুন। নিজের ঈশ্বরকে ধ্যান করতে করতে ব্যায়াম করুন। যোগব্যায়াম করা নিয়ে আস্তিক ও নাস্তিকদের মধ্যে বিভেদ না থাকাই উচিত। মানবকল্যাণে শরীরের নানা ব্যাধি উপশমার্থে এই যোগচর্চা সারা পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য হোক।

আজকাল নাচের সঙ্গে, জিমে অভ্যাসকালে এক্রোবেটিকস অভ্যাসকালে যোগ ভঙ্গিমাগুলোকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছে। তাতে সুফলও উন্নতি হচ্ছে। যারা অলস অনিচ্ছুক যোগাসন করতে তারা উৎসাহিত হচ্ছে। এটি একটি শিক্ষামূলক বিদ্যা তাই বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। শংসাপত্র দেওয়া ও নিয়োগ চলছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এ বিষয়ে নানা উৎসাহমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত করছেন। এই বছর ২০২৩ এ তিনি যোগদিবস পালন করেছেন আমন্ত্রিত বৈদেশিক ডেলিগেটসদের সঙ্গে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও যোগশিক্ষা প্রবর্তনের নানা কর্মসূচি নিয়েছেন ও উদ্‌যাপন করেছেন। এটি অত্যন্ত গৌরবময় কথা। এ প্রসঙ্গে রামদেব বাবাজীর নাম প্রাতঃস্মরণীয়। পশ্চিমবঙ্গে যোগশিক্ষাকেন্দ্র কম নেই। তবু শ্রীরামদেব যেন এক মূর্তমান ঝড়। সকালে নানা চ্যানেলে দূরদর্শন কেন্দ্রে যোগ শিক্ষার আসর বসে। দেখি ও জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। পতঞ্জলি যোগপীঠ দেখতে দেখতে গড়ে উঠেছে এই ভারতের মাটিতে হরিদ্বারে বিশাল অর্থনৈতিক ব্যাপ্তি নিয়ে। পতঞ্জলির ওষুধ, প্রসাধনী দ্রব্য, ফল ও খাদ্যদ্রব্য রমরম করে বিক্রিত হচ্ছে। বিশাল ব্যবসা যোগ চিকিৎসা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে। যোগ চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা আছে (যেমন : অপারেশন, সিজার কেস, বাইপাস সার্জারি অস্থি সংস্থাপন সেলাই) এটা মেনে নিয়েও এর উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তির ব্যক্তিগত মনের জোর, আগ্রহ, নিষ্ঠা, পরিবর্তিত লাইফস্টাইল ইত্যাদি নির্ভর করছে তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য।

নারীজাতির স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের ওপর ভরসা করে পরবর্তী প্রজন্ম। সাধারণত ভারতীয় সমাজে নারীজাতি সঠিক আমীষ খাবার পায় না। সংসারে তারা নিজেদের শ্রম উজাড় করে দিতে অভ্যস্ত। দরিদ্র্যের পরিবারে নারী শোষিত হয় বেশি। অহেতুক এলোপ্যাথ ওষুধ না কিনে আয়ুর্বেদিক ওষুধ সেবন করা বাঞ্ছনীয়। তার সঙ্গে চাই ব্যায়ামের অভ্যাস। তবে আয়ুর্বেদিক ওষুধের বাজার চড়া হয়ে উঠছে। যারাই যোগ করান তারাই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করার নির্দেশ দেন। বিত্তশালী লোকের কাছে ব্যাপারটা কিছুই না। অনেকে বাড়িতে বিউটিশিয়ান ডেকে নেবার মতো যোগ প্রশিক্ষককে ডেকে নেন। মাথাপিছু আড়াই থেকে তিন হাজার নেন। রেট এরিয়া অনুযায়ী ধনী/গরিব পরিবার বা অসুখের গভীরতা অনুযায়ী ওঠানামা করে। সৌভাগ্যবশত শ্রী অমর নন্দীর তত্ত্বাবধানে থেকে ও তাঁর প্রস্তাবিত খাদ্যাভ্যাস ও ওষুধ সেবন করে আমার যারপরনাই সুফল লাভ হয়েছিল। যুগ ও পরিবেশ জটিল ও দূষিত হওয়ায় মাত্র একটি পন্থায় চিকিৎসা করে ভালো হয়ে ওঠার আশা শেষ। তবে যুগপৎ এলোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ করা ভালো নয়। আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্যের পুস্তকাদি এ বিষয়ে স্মরণযোগ্য। আমাদের ভারতে মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে উৎকৃষ্ট বনৌষধি পাওয়া যায়।

নারীদের বেশি করে ব্যায়ামে মনোযোগ দেওয়া দরকার। তাঁদের শরীর সন্তানোৎপাদনের জন্য জটিল হয়ে থাকে প্রকৃতিগতভাবে। আধুনিক শিক্ষিতা নারীরা সহজ প্রসবব্যথাকে ভয় পেয়ে সিজার পদ্ধতি ব্যবহার করে। অথচ যোগানুশীলনে অল্প ব্যথায় সরল প্রসব সম্ভব হয়। আজকাল অনেক দম্পতির সন্তান জন্ম দেওয়ায় অনীহা। সে সব বিতর্কের ভিতর যেতে চাই না। এত কাজ যে সময় পাই না ব্যায়াম করার–এ সব বাহানা লেম এক্সকিউজ। অল্পবয়সে ১০/১২ বছর বয়স থেকে ব্যায়াম করা শুরু করলে সারাজীবন অসুখের প্রকোপ থেকে রেহাই পাবে। বিশেষত করোনা যখন কান মলে শিক্ষা দিয়ে গেছে মানবসভ্যতাকে (অসভ্যতাকে)। করোনার পরে মানুষ আরো স্বাস্থ্যসচেতন হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। এক মাঘে বিপদ যায় না। আবারো যে করোনা ফিরে আসবে না তার গ্যারান্টি কোথায়?

আজকাল নাচের সঙ্গে, জিমে অভ্যাসকালে এক্রোবেটিকস অভ্যাসকালে যোগ ভঙ্গিমাগুলোকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছে। তাতে আরো গতি ও সুফল ও উন্নতি হচ্ছে। যারা অলস অনিচ্ছুক যোগাসন করতে তারা উৎসাহিত হচ্ছে। এটি একটি শিক্ষামূলক বিদ্যা তাই বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে ভারতবিচিত্রা পত্রিকা। পত্রিকাটিতে সাহিত্যকর্ম ও মানব উন্নয়নে ভারতের নানা উদ্যোগ বিশেষত বাংলাদেশের সঙ্গে ঘটে চলেছে। আন্তর্জাতিক যোগদিবস পালিত হচ্ছে উভয় দেশের আন্তরিক সহযোগিতায়। এ প্রসঙ্গে ড. সত্যজিৎ বিশ্বাসের 'অষ্টাঙ্গযোগ' নামক প্রবন্ধটি অতি অবশ্যই পঠনীয়। ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার এর অভূতপূর্ব কার্যকলাপ দেখা এক আহ্লাদের কারণ। দিকে দিকে যোগের জয়জয়াকার।

অতি আধুনিক যোগ শিক্ষা ও অভ্যাসের জন্য রয়েছে দড়ির ব্যবহার, বিশাল রাবারের বল, চেয়ার, এমনকি ঘরের দেয়াল, নানারকম বক্স ইত্যাদি। যোগাসনের সঙ্গে অন্যান্য শরীরচর্চার পদ্ধতিতে একটা পার্থক্য থাকে সেটা হলো যোগাসনে শরীর ও মনের আরাম একসঙ্গে হয়। এর সঙ্গে থাকে খাদ্যাভ্যাস। একেক দেশের খাদ্যাভ্যাস একেক রকম। সব দেশেই ন্যুট্রিশানিস্ট আছেন। সাধারণত সুষম আহার ও প্রত্যেকের শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। পৃথিবীতে রোগবালাই অসুখ বিসুখ বেড়েই চলেছে। ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের কী মহান পরিমণ্ডল আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে সযত্নে। সাধারণ মানুষ আজ দিশাহারা। তীব্র লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় সিংহভাগ জনগণকে। এর মধ্যে যতটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব করতেই পারি। আর সেটাই হলো যোগচর্চা। সাধারণত সুস্থ জীবন যাপনের উদ্দেশে খুব কঠিন কঠিন ব্যায়াম করার দরকার হয় না।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী বরাহনগর কোলকাতার বলছেন, '... দেবভাব সর্বমানুষের ভিতরে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে–ইহাই প্রকৃতির লক্ষ্য, ইহাই মানবজীবনের লক্ষ্য, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়।... এই উদ্দেশেই ঋষিরা যোগবিদ্যা উদ্ভাবন করিয়াছেন।' আমার অভিজ্ঞতা বলে অহিন্দু, নাস্তিক সবাই যোগচর্চা করুক। এর বাস্তব, সুফলময় দিকটি প্রস্ফুটিত হবেই। •

দেবযানী বসু ॥ কবি ও প্রাবন্ধিক

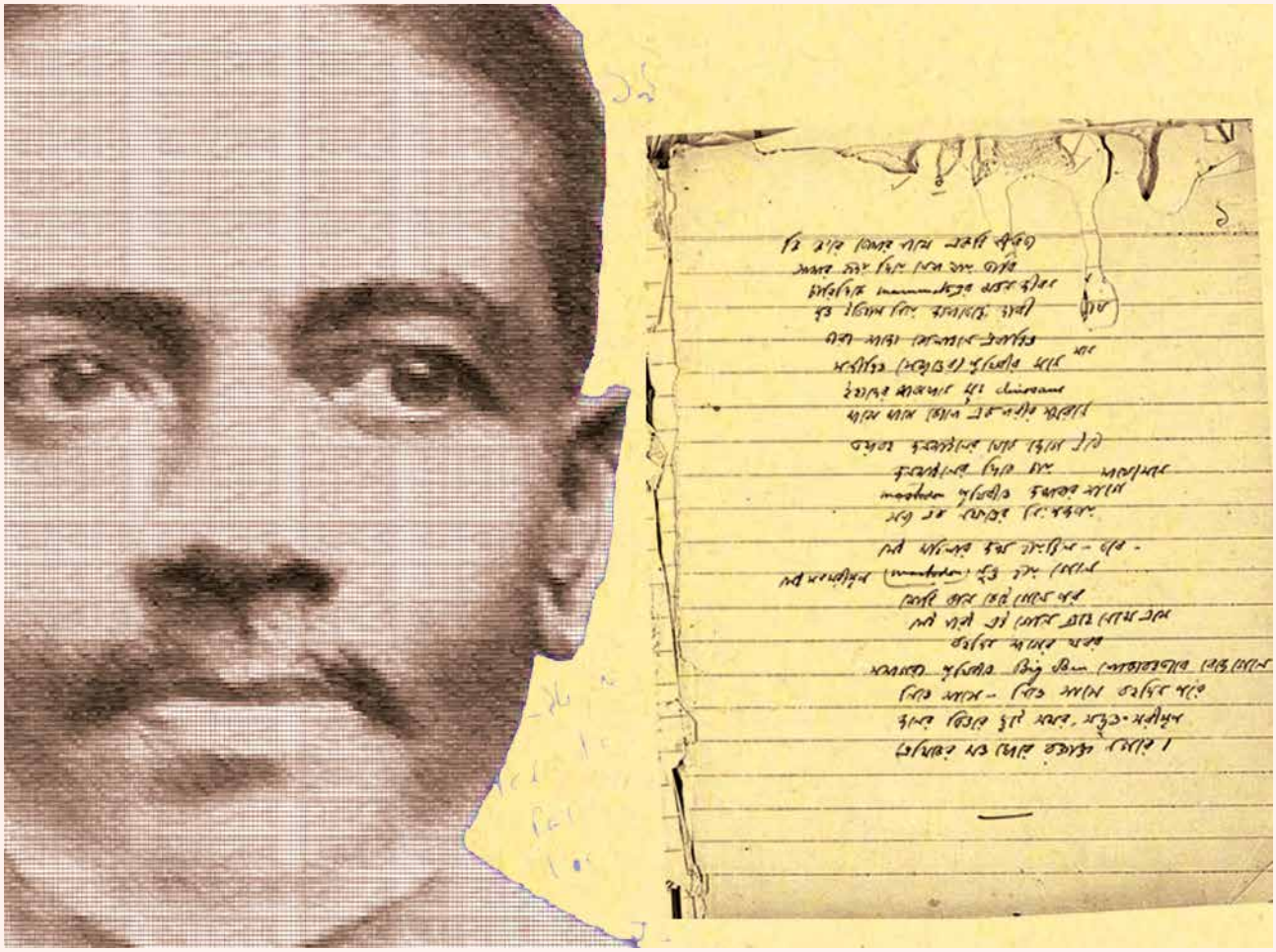

পাণ্ডুলিপি থেকে

জীবনানন্দ দাশের নতুন কবিতা

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

দুর্লভ

১৯৫৪ সালে কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর ট্রাঙ্কবন্দি অবস্থায় তার লেখার খাতাগুলো পাওয়া যায়। কিছু খাতা পরবর্তীকালে হারিয়ে যায়। কলকাতায় অবস্থিত ভারতের জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের রেয়ার বুক কালেকশনে জীবনানন্দের ৪৮টি কবিতার লেখার খাতা সুসংরক্ষিত রয়েছে। ভূমেন্দ্র গুহ স্বয়ং ৩৪টি খাতা থেকে ১,৫৭০টি কবিতার মূলানুগ পাঠ ১৪টি খণ্ডে প্রকাশ ক'রে গেছেন। এছাড়াও, বাকি খাতাগুলির অধিকাংশ কবিতা বিভিন্ন হাতে পাঠোদ্ধারক্রমে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ৩৫ সংখ্যক থেকে শুরু করে পরবর্তী অন্যান্য কবিতার খাতায় যে কবিতাগুলো রয়েছে তার মধ্যে কোন্‌গুলি প্রকাশিত ও কোন্‌গুলি অপ্রকাশিত তা নিরূপণ একটি দুরূহ কাজ। কারণ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সব কবিতার একটি তালিকা অদ্যাবধি প্রণীত ও প্রকাশিত হয়নি। পাণ্ডুলিপির খাতা থেকে নতুন কবিতা উদ্ধারে এটি একটি বড় প্রতিবন্ধকতা

ভারতের জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে জীবনানন্দের কবিতার খাতাগুলোকে কালানুক্রমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন উপর্যুক্ত ৪৮টি খাতার মধ্যে ৬ সংখ্যা চিহ্নিত খাতাটির সূচনাপত্রে কবি বাংলায় লিখেছিলেন 'কবিতা' 'শ্রী জীবনানন্দ দাশ' এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে ইংরেজিতে লিখেছিলেন 'March, 1934'। উল্লেখ্য, এ খাতায় মাত্র ২/৩ দিনের অবকাশে জীবনানন্দ দাশ একনাগাড়ে ৭৩টি কবিতা রচনা করেছিলেন, শেষের কয়েকটি বাদ দিলে যার প্রায় সবই সনেট বা চতুর্দশপদী। ১৯৫৭ সালে কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশের উদ্যোগে সিগনেট প্রেস থেকে এ খাতাটির ৬১টি কবিতা নিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থের নাম রাখা হয় 'রূপসী বাংলা'। একইভাবে ৪০ সংখ্যক খাতার প্রথম পাতায় লেখা আছে–Poem/JDas/Barisal/ May 1946/1947 1st June/ Barisal–এখানে দুটি সময়ের কথা উল্লেখ আছে। ১৯৪৬ এর মে মাসে জীবনানন্দ বরিশালে অবস্থান করছিলেন। তবে অল্প সময় পর তিনি বি.এম. কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতা চলে যান। তাই এ খাতার কিছু কবিতা বরিশালে থাকতে লেখা, বাকিগুলি কলকাতা যাওয়ার পর লেখা।

এ তথ্যাবলির প্রাসঙ্গিকতা এই যে, ৩৫ সংখ্যক দুটি খাতা রয়েছে, যথা ৩৫(ক) এবং ৩৫(খ)। অর্থাৎ ৩৫ থেকে ৪৮ সংখ্যক খাতার সংখ্যা মোট ১৫। এ ১৫টি কবিতার খাতায় নতুন কবিতা আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দেখা যায়, ৩৫(ক) থেকে শুরু ক'রে ৪৮ পর্যন্ত ১৫টি খাতায় কবিতার সংখ্যা নগণ্য। ১৯৪৭ সালে দৈনিক 'স্বরাজ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকরিটি চলে যাওয়ার পর জীবনানন্দ কবিতা কম লিখেছেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে জীবনানন্দ দাশ নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত ছিলেন। ১৯৫৪ সালে, যে বছর অক্টোবরে তাঁর মৃত্যু হয়, সেবছর লেখা কবিতার সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। ১৯৫৪ সাল চিহ্নিত ৪৮ সংখ্যক খাতায় লিখিত কবিতার সংখ্যা মাত্র চার।

পাণ্ডুলিপি থেকে নতুন কবিতা পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে জীবনানন্দীয় বানানরীতির কথা মনে রাখা দরকার। যেমন জীবনানন্দ দাশ সবসময় 'সাদা' না লিখে 'শাদা' লিখতেন। জীবনানন্দ দাশ রেফ্ এর পরে দ্বিত্ব বর্জন করেননি যেমন 'কার্ত্তিক'। 'সূর্য্য' বানানের ক্ষেত্রেও একই কথা। অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ সচরাচর ঊর্ধ্ব কমা ব্যবহার করেছেন। নতুন কবিতা পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে মূলানুগত্য বজায় রাখা সমীচীন হবে। তাই 'তার পর', 'কত দিন', 'কত বার', 'বহু দিন' ইত্যাদি এক শব্দ হিসেবে না-ধ'রে দুটি পৃথক শব্দ বিবেচনা করা হয়েছে।

২.

২০২০ সালে পাণ্ডুলিপির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ৪০ সংখ্যক কবিতার খাতায় একটি কবিতা পাওয়া গিয়েছিল যা সম্পূর্ণ অপরিচিত। এর প্রথম পঙ্‌ক্তি ছিল : 'যাদের ক্ষমা অক্ষমা সাধ অন্ধকারে ফুরিয়ে গেছে আজ' এবং শেষাংশ 'তোমার জলকণিকা ভেঙে জল করেছ আমায় তোমার মত অনন্ত নদীর'। অনেক যাচাই করে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল এ কবিতাটি কবি ভূমেন্দ্র গুহ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল রায়, আবদুল মান্নান সৈয়দ, অমৃতানন্দ দাশ বা প্রভাতকুমার দাস প্রমুখ কারো সংকলনে বা লেখায় মুদ্রিত বা উল্লিখিত হয়নি। এ কবিতাটি পাঠোদ্ধার করে প্রকাশ করা হয়েছে।

৪০ সংখ্যক কবিতার খাতাটির বৈশিষ্ট্য হলো এটি সম্পূর্ণ কালিতে লেখা, এবং সে কালি আজো এতটুকু শুকিয়ে যায়নি। জীবনানন্দ দাশের হাতের লেখাও স্পষ্ট। সুতরাং আদি খসড়া পাঠে সমস্যা হয়নি। অধিকন্তু, কাটাকুটি বা বিকল্প শব্দের ইংগিত ছিল না বললেই চলে। ফলে কবিতাটির নির্ভুল প্রতিলিপি তৈরিতে কার্যত বেগ পেতে হয়নি। অন্যদিকে পাঠোদ্ধারের অপেক্ষায় অল্প হলেও কিছু কবিতা রয়েছে যেগুলোতে জীবনানন্দের হাতের লেখা অস্পষ্ট ও জড়ানো এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুষ্পাঠ্য। উপরন্তু বিস্তর পেন্সিলে করা কাটাছেঁড়া রয়েছে যদ্দরুণ পরিমার্জিত সংস্করণ তৈরিতে বেগ পেতে হয়। যারা জীবনানন্দ দাশের কবিতা লেখার সঙ্গে পরিচিত তারা জানেন একটি কবিতা লিখতে অনেক খসড়া করতেন কবি, অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতেন। এমনকি প্রকাশের জন্য পত্রিকায় পাঠানোর পূর্বমুহূর্তেও পরিমার্জনা করতেন। এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ জীবনের উপান্তে রচিত 'দুদিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ' কবিতাটির পাণ্ডুলিপি দেখা যেতে পারে।

৩.

পাণ্ডুলিপি থেকে জীবনানন্দের লেখা উদ্ধারে আফসার উদ্দিন এবং ভূমেন্দ্র গুহ প্রমুখ যে ধৈর্য ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা অতুলনীয়। তাদের অনুসরণ করে জীবনানন্দের কবিতার খাতা থেকে কবিতা পাঠের কৌশল রপ্ত করা অসাধ্য নয়। পাণ্ডুলিপিতে হস্তাক্ষর স্পষ্ট হলেও কয়েকটি জীবনানন্দীয় বিষয়ে ধারণা থাকার দরকার হয়। যেমন, পাণ্ডুলিপিতে বেশ কিছু শব্দ নিম্নরেখ। এত দিনের পাণ্ডুলিপি পাঠের অভিজ্ঞতায় এবং কবি ভূমেন্দ্র গুহের শিক্ষকতায় আমরা জানি কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নিম্নরেখ করার মানে হচ্ছে ঐ অংশ পরিবর্তন ক'রে জীবনানন্দ দাশ ভিন্ন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় শব্দ বা শব্দগুচ্ছ নিম্নরেখ ক'রে জীবনানন্দ দাশ বিকল্প শব্দ লিখে রেখেছিলেন। এসব ক্ষেত্রে বিকল্পটি গ্রহণ করা বিধেয়।

এছাড়াও প্রতীয়মান হয়েছে যে, যে-ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ দুটি বিকল্পের কথা ভেবেছিলেন সেক্ষেত্রে শেষোক্তটি ব্যবহার করা সমীচীন হবে। যেমন 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা' কাব্যে 'এক দিন যদি আমি' শিরোনামীয় ৪০ সংখ্যক কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে মূল শব্দ 'করাচি'র বিকল্প হিসেবে 'মাদ্রাজের/বিদেশের' দুটি শব্দ ভেবেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। শেষোক্ত বিকল্প অর্থাৎ 'বিদেশের' ব্যবহার যৌক্তিক হবে। একই ভাবে 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা' কাব্যে ৪৫ সংখ্যক কবিতার সপ্তম পঙ্‌ক্তিতে মূল শব্দ 'ভিজে'র পরিবর্তে জীবনানন্দ দুটি বিকল্প যথা 'নগ্ন/ক্লান্ত' ভেবেছিলেন। এ ক্ষেত্রে শেষোক্তটি গ্রহণ করাই সমীচীন।

এছাড়া পাণ্ডুলিপিতে আরেকটি জীবনানন্দীয় বিষয় হলো কোনো শব্দ, শব্দগুচ্ছ বা পঙ্‌ক্তি বন্ধনীভুক্ত করে রাখা। বিভিন্ন কবিতার পাণ্ডুলিপি ও কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত পাঠ পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় জীবনানন্দ বন্ধনীভুক্ত শব্দ বা পঙ্‌ক্তি সম্পূর্ণ বর্জন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু না কেটে দিয়ে বন্ধনী ব্যবহার করেছেন।

পাণ্ডুলিপি থেকে নতুন কবিতা পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে জীবনানন্দীয় বানানরীতির কথা মনে রাখা দরকার। যেমন জীবনানন্দ দাশ সবসময় 'সাদা' না লিখে 'শাদা' লিখতেন। জীবনানন্দ দাশ রেফ্ এর পরে দ্বিত্ব বর্জন করেননি যেমন 'কার্ত্তিক'। 'সূর্য্য' বানানের ক্ষেত্রেও একই কথা। অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ সচরাচর ঊর্ধ্ব কমা ব্যবহার করেছেন। নতুন কবিতা পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে মূলানুগত্য বজায় রাখা সমীচীন হবে। তাই 'তার পর', 'কত দিন', 'কত বার', 'বহু দিন' ইত্যাদি এক শব্দ হিসেবে না-ধ'রে দুটি পৃথক শব্দ বিবেচনা করা হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশের বিরামচিহ্ন রীতি প্রসঙ্গেও দু-একটি কথা বলা দরকার। বিরামচিহ্নের ক্ষেত্রে আমরা জীবনানন্দীয় রীতি অনুসরণ করার প্রতি পক্ষপাত। যেমন, সেমিকোলনের আগে ফাঁক বা স্পেস দেওয়া। বাংলা সফটওয়্যারে 'হাফ স্পেস' প্রদানের সুযোগ না-থাকায় পূর্ণ স্পেস দেওয়া হয়েছে। জীবনানন্দ কখনো কখনো কমা'র পর ড্যাশ ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত কবিতাতেও দেখা যাচ্ছে কমা-ড্যাশের ব্যবহার। আরো লক্ষ্যণীয়, পাণ্ডুলিপিতে 'ড্যাশ'-এর আগে-পরে স্পেস আছে।

আমরা জানি প্রচুর 'ড্যাশ (–)' ও 'সেমিকোলন (;)' ব্যবহার করতেন জীবনানন্দ দাশ। সাধারণত আমরা মোস্তফা জব্বার কর্তৃক উদ্ভাবিত 'বিজয়' সফটওয়্যার ব্যবহার করি; কিন্তু এতে দীর্ঘ ড্যাশ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। সেমিকোলনের আগে অর্ধ স্পেস দেওয়ার রীতি রক্ষার সুযোগও 'বিজয়'-এ নেই। প্রকৃতপক্ষে, কোনো বাংলা সফটওয়্যার এখনো যথাযথ মাপের ড্যাশ

অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি।

আরেকটি প্রশ্ন হলো অন্বয়মূলক দুই শব্দের মধ্যে হাইফেন দিয়ে শব্দজোড় গঠন করা সমীচীন হবে কিনা। যেমন : বার বার, পাতা ছাওয়া, চোখে মুখে, আসা যাওয়া ইত্যাদি। স্মরণীয় যে জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপিতে না থাকলেও কবি ভূমেন্দ্র গুহ এসব ক্ষেত্রে 'হাইফেন' ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। পাণ্ডুলিপিতে হাইফেন না-থাকলেও শত শত ক্ষেত্রে তিনি হাইফেন দিয়ে শব্দজোড় গঠন করেছেন। আমরা এই পরিবর্তনের পক্ষপাতী নই।

পাণ্ডুলিপির খাতায় প্রায় সকল ক্ষেত্রে অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্ব কমা তথা লোপচিহ্ন ব্যবহার করেছেন জীবনানন্দ। ব্যতিক্রম 'হতে' 'হবে'। ঊর্ধ্ব কমা বাদ দেওয়ার নীতি অবলম্বনেরও আমরা পক্ষপাতী নই। 'কোনো' এবং 'কোনও' নিয়ে সংশয়ে সৃষ্টির কারণ রয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে অনেক ক্ষেত্রেই কবি 'কোনো' না-লিখে 'কোনও' লিখেছেন। কবি ভূমেন্দ্র গুহ সর্বক্ষেত্রে 'কোনো'-কে শুধরে 'কোনও' করার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাচীন রীতি ব'লে জীবনানন্দের বানানরীতি বর্জন করা সমীচীন মনে হয় না।

জীবনানন্দ ভুল বানান লিখেছেন এরকম নজির কবিতার খাতাগুলোতে দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে সন্দেহ নেই, জীবনানন্দের 'সুধালাম'কে আধুনিক সময়ের যে কোনো প্রুফরিডার 'শুধালাম' হিসেবে সংশোধন করবেন। একই কথা চন্দ্রবিন্দুসম্বলিত 'হঁট'-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৪.

আমরা সম্যক অবহিত যে পাণ্ডুলিপি থেকে কবিতার নির্ভরযোগ্য পাঠ উদ্ধার করা একটি সমস্যাসঙ্কুল কাজ। এ কথা মাথায় রেখেই জীবনানন্দ দাশের ৩৫ (ক) সংখ্যক কবিতার খাতা থেকে দুটি ও ৩৮ সংখ্যক কবিতার খাতা একটি, মোট তিনটি কবিতার পাঠ উপস্থাপন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, পাণ্ডুলিপিতে কবিতার শিরোনাম দিতেন না জীবনানন্দ। শিরোনাম লিখতেন পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের জন্য পাঠানোর সময়। পাণ্ডুলিপির অনামাঙ্কিত কবিতার ক্ষেত্রে আমরা প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকে শিরোনাম নির্ধারণের পক্ষে। সেভাবেই তিনটি কবিতার শিরোনাম নির্বাচন করা হলো।

কি করে তোমার নামে একটি কবিতা লেখা যায়

জীবনানন্দ দাশ

কি ক'রে তোমার নামে একটি কবিতা
আমার হৃদয় দিয়ে লেখা যায় ভাবি
চারিদিকে ম্যামথ-এর মতন জীবন
মৃত ইতিহাস নিয়ে জানাতেছে দাবি
তারা আজো কোলাহলে প্রবাহিত
সন্দীপিত পৃথিবীর মনে
ইহাদের মাঝখানে মূঢ় ডাইনোসর
মাঝে মাঝে কোনো এক নারীর স্মরণে

ভয়াবহ জলমাইলের থেকে জেগে উঠে
জলমাইলের দিকে চায়
মাস্টোডন পৃথিবীতে জন্মাবার আগে
অন্য এক নক্ষত্রের নিঃশব্দতায়

সেই মহিলার জন্ম হয়েছিল – তবে –
সেই সব সরীসৃপ লুপ্ত হয়ে গেলে
কোটি কাল কেটে গেলে পর
সেই নারী এই গোল গ্রহে নেমে এসে
বহুদিন আগের খবর

সসাগরা পৃথিবীর বিগবেন শোকাবহ ভাবে বেজে গেলে
নিতে আসে – নিতে আসে বহুদিন পরে
জলের ভিতরে ছুটে অমর, অদ্ভুত সরীসৃপ
প্রেমিকের মতো ঘোরে রক্তাক্ত নগরে।

(রচনাকাল : আগস্ট ১৯৪১। খাতা-৩৫ক)

সামাজিক পরিবেশে চায়ের আসরে

জীবনানন্দ দাশ

সামাজিক পরিবেশে চায়ের আসরে আড্ডা মাঝামাঝি জমেছে এমন
গাধার রগড় শুনে অনেক দেখেছি আমি সমবেত কুকুরের কান
খাড়া হয়–তারপর বার হয়ে আসে বিষদাঁত
এখানে সে সব নেই–নিজেদের মৌতাতে নিজেদের প্রাণ
ঈষৎ সুদীর্ঘ হয়ে নড়ে যায় দেখা গেল যখন হঠাৎ
ভোরের সিঁড়ির পথ বেয়ে আমি ছাদের উপরে
দাঁড়ালাম একা গিয়ে নগরীর নীলিমার নিচে
কুলোর মতন কান অনপনেয়ভাবে নড়ে
যেইখানে সৃষ্টির মহনীয় মহান হাতীর
দু-চার মুহূর্ত্ত আমি এমন বিষম মনোভাবে
দাঁড়াতেই দেখা গেল আকাশপ্রদীপে শঙ্খচিল
হিসাবের গরমিল সোনালি ও নীল এই পাখির হিসাবে।

(রচনাকাল : আগস্ট ১৯৪১। খাতা ৩৫ক)

এখন হেমন্ত রাত্রি

জীবনানন্দ দাশ

এখন হেমন্ত রাত্রি
কোথাও কোনো নগরীতে ছিলাম না যেন
হাজার বছর আগে
ঘাসে শিশির বাতাবি বনের জ্যোতিছায়া ও জল্পনার ভিতর চাঁদ
নিভে জ্বলে উঠছে
এই সমাধি শীত
শান্ত মৃতদের

এই পবিত্র অন্ধকারে হেমন্ত রাত্রি
এছাড়া বাইরে মলিন নদীর অবধি নেই
অসংখ্য রক্তের নদী তোলপাড় করছে
কে সেই আবিলতাকে ফুরিয়ে
এই নির্মলাতাকে গ্রহণ করবে
সেই কাংস্য–বন্দর বিমোহ–ক্রেংকার এড়িয়ে
এই নির্জ্জনতাকে

আহা, দেওদারবীথি, ঘাস, শিশির, বাতাবী বন
আমি শুধু একটি মৃতাকে পাবার জন্য এসেছিলাম
আমার অনপনেয় অনন্ত জীবিতদের রৌদ্রে সুদূর
দিল্লী–বোম্বে–কলকাতায় সকলকে অগ্রসর হতে দিয়ে

অনেক মহাশ্বেত ঘোড়ার রঙে নীল
আকাশ ভরে ফেলে ঢের
শ্বেতশক্তি গর্জ্জন করছে সেখানে

জয় – নব নব প্রভাতের জয়

এইখানে নিরায়োজন সব
এখন অঘ্রান সব
অঘ্রানের রাত্রি, হাওয়া, থেমে যাওয়া– এসে থেমে থাকা
হাজার বছর আগে নারি, এক নগরীতে তুমি
চলে গিয়ে ছিলে বলে আজকে হেমন্তরাতের পল্লীভূমি
ন্যাগ্রোধ শ্মশান ঘাস শিশির তারার অগ্নি পাখি
প্রভৃতি আশ্চর্য্য সব সনাতন জিনিসের মনে একাকী।

(রচনাকাল : অক্টোবর ১৯৪৫। খাতা-৩৮)

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী ॥ জীবনানন্দ গবেষক ও
প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

কলিম খান

বাঙালির আত্মশক্তি ও একজন কলিম খান

স্বরলিপি

প্রবন্ধ

বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ও গবেষক কলিম খান বাঙালিকে আত্মশক্তি যোগাতে যে অবদান রেখে গেছেন তা শোধ হবার নয়। এই আত্মশক্তি নামক বৃক্ষের গোড়ায় জল সেচনের জন্য তিনি খনন করেছেন ভাষার শরীর। তারপর বাঙালির সামনে উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন তার গৌরবের ইতিহাস, ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন শেকড়ের ঘ্রাণ। মৌলবাদ, স্বাধীনতা, বিশ্বায়ন, ইজম, শাসক ও শাসিতের ধরন আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তরের ভেতরেই খুঁজতে হবে আমরা আসলে কোথায় ছিলাম। অতীত মানে বিস্মৃতি। কিন্তু সে এক বিশাল জগৎ। সেখান থেকে সবটুকু তথ্য হাজির করা কঠিন। কিন্তু সারাংশটুকু হাজির করেছেন কলিম খান। এজন্য তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্যের কাছে। সমাজে আগে যেভাবে সফল হওয়া গিয়েছিল, পরে ঠিক তেমনটি করবার যে নীতি তাকে মৌলবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন কলিম খান

তিনি দেখান যে মৌলবাদ মানুষকে কালের প্রকোপে জগতের পরিবর্তনশীলতার কারণে মরুবালিরাশির ভেতর হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। আবার এই নীতি একদিন গড্ডালিকা প্রবাহে পরিণত হয় এবং শুকিয়ে যায়। এতে প্রাণের জোয়ার থাকে না।

পরিবর্তনশীলতার ভেতর মৌলবাদ থাকতে পারে, কখন থাকতে পারে? কলিম খান দেখান যে, আগের কোনো কিছুই মানব না, এই গোঁয়ার্তুমিও এক প্রকার কট্টরতা এবং এক প্রকারের বিকৃত মানবিক জীবননীতি। এই নীতি একদিকে জীবন বিরোধী, অন্যদিকে অবাস্তব। অসীম স্বাধীনতাকে তিনি বলতে চেয়েছেন নৈরাজ্যবাদ।

সীমাহীন স্বাধীনতার ধারণার প্রভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়; বিশৃঙ্খলা শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলে পরিণত করার প্ররোচনা দেয় আর নৈরাজ্যবাদ ঠিক একইভাবে মৌলবাদকে আরও কঠোর ও প্রতিশোধাত্মক হওয়ার যুক্তি সরবরাহ অব্যাহত রাখে।

কলিম খানের সোজা স্বীকারোক্তি, নৈরাজ্যবাদকে আপাতদৃষ্টিতে মৌলবাদের বিপরীত পক্ষ মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে সে তা নয়। সে আরেক প্রকারের কট্টরতা এবং আদতে মৌলবাদের নামান্তর।

মলয় রায়চৌধুরী কলিম খানকে দার্শনিক এবং অধুনান্তিক ভাবুক হিসেবে উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভারত কয়েক হাজার বছরের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে পরিচিত, মানব ইতিহাসের সেই এলাকাটির ভাষা-বিধৃত মনীষার মধ্যে বিপর্যয়ের অনুসন্ধান করেছেন কলিম খান। তার চিন্তার আলো পড়েছে জীবনের সঙ্গে যুক্ত সামগ্রিকতার কার্যকারণের ওপর।

সমাজের অভ্যন্তরে একটি 'ইজম' উৎপন্ন হয়ে প্রভাব বিস্তার করে, সফল হয়; শেষ না হয়ে অনেকগুলো প্রবণতা তৈরি করে। ঠিক এই সূত্রটি তিনি পোস্টমর্ডানিজম ক্ষেত্রে দেখালেন। কলিম খান আরও স্পষ্ট করেছেন, আমাদের চিন্তার এলাকাটি পশ্চিমের চিন্তা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীকে দেখার প্রবণতা পেয়েছে। কিন্তু পৃথিবীকে জানা ও বোঝার জন্য এই অঞ্চলের নিজস্ব প্রাচীন নিরীখ, প্রতীক, চিহ্ন, চরিত্র বা মডেল, প্রবাদ, রূপকল্প, নীতিকথা, শব্দের উৎস, ঘটনাক্রম, টোটেম, লিপি, আখ্যানসমূহ রয়েছে। সেই বিশাল প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়ে আমাদের আগামী কালপ্রবাহকে জানার চেষ্টা করিনি। এখানে বিরাজ করছে শিথিলতা।

মানুষ বসবাস করছে মিশ্র সভ্যতায়। সময় এখন নিজেদের জাতিসত্তা পরিত্যাগের। সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংগীত, নৃত্য, কৃষি, খাদ্যাভাস, গৃহনির্মাণ, রান্না সব কিছুতেই চলছে মিশ্রণ প্রক্রিয়া। জাতিগুলোর সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে শুরু হয়েছে এক বিশেষ প্রতিযোগিতা। যা বিশ্বমানবের স্বীকৃতি চায়। যে হেরে যাচ্ছে, যা হেরে যাচ্ছে সে এবং তা চলে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতলে। নিজেদের যা কিছু মহৎ অর্জন তা কিছু নিয়ে বিশ্বমানবের সামনে হাজির হওয়ার প্রতিযোগিতা–তৈরি করেছে এক অদৃশ্য যুদ্ধ। অস্তিত্ব রক্ষার এ এক অবধারিত সংঘর্ষ। কলিম খান দেখান যে, সবার সব সেরা গুণগুলোর ধারক হবে আগামী যুগের মানুষ। কর্পোরেট সংস্থাগুলো নিজেদের অজান্তেই তেমন মানুষের প্রয়োজন অনুভব করছে, যে মানুষ সরব-গুণে গুণী। আর ঐরকম মানুষের চাহিদা বাড়লে তার যোগান তো বাড়বেই। এই সামাজিক চাহিদাপ্রবণতা 'National Steretpes' হয়ে যাবে 'Generalised'।

প্রাচীন লোককথা, ধর্মের বাণী, মনীষীদের ভাষণে 'সব মানুষই এক' এই জাতীয় কথা ছিল এখনও আছে। সেই সব ইঙ্গিত উদ্ধারে কলিম খান যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, সেটি হলো 'ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি'। তার মতে, প্রাচীন ভারতের প্রকৃত ইতিহাস, গল্পগাছা, রূপকথা, মাইথলজি, ছাইপাঁশ ভেবে যেগুলো অনাদরে ফেলে রাখা হয়েছে, সেগুলোই।

তাহলে এক অভিন্ন জাতির মহাভাষা নির্মাণের পথ কতদূর? কলিম খান দেখান যে, ভাষাবিদরা মনে করছেন ভাষার বীজ খুঁজে পেলেই মহাভাষা নির্মাণ সম্ভব। কিন্তু এখনও তা কল্পনামাত্র। বিশেষ করে প্রতীকী ভাষায় অভ্যস্ত মানুষের পক্ষে ভাষার বীজ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তার বিবেচনায় ভাষার যদি দুইটি পা ধরা হয় সিনট্যাক্স (ব্যাকরণ) ও সেমান্টিকস (শব্দার্থতত্ত্ব)-কে, তাহলে বলতে হবে এই যুগের ভাষাতত্ত্বেও ব্যাকরণ জ্ঞান হচ্ছে দুরন্ত গতিসম্পন্ন একটি ঘোড়ার পা, আর তার শব্দার্থ জ্ঞান হচ্ছে অক্ষম জড় কাঠের পা।

সমাজের অভ্যন্তরে একটি 'ইজম' উৎপন্ন হয়ে প্রভাব বিস্তার করে, সফল হয়; শেষ না হয়ে অনেকগুলো প্রবণতা তৈরি করে। ঠিক এই সূত্রটি তিনি পোস্টমর্ডানিজম ক্ষেত্রে দেখালেন। কলিম খান আরও স্পষ্ট করেছেন, আমাদের চিন্তার এলাকাটি পশ্চিমের চিন্তা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীকে দেখার প্রবণতা পেয়েছে।

এখানে কলিম খানের উচ্চারণ কিছুটা ভীতস্থত এবং গর্বিত করে। তিনি দেখান, বিশ্বের মানুষ গ্লোবালাইজেশনের মাধ্যমে এক জাতিতে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে। সেখানে একটি ভাষাই সুপার ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে উঠে আসবে। সেই সম্ভাবনায় ইংরেজি এগিয়ে। কিন্তু এতে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু নেই। তার কারণ, সফ্‌ট্‌ওয়ারের আবির্ভূতা যেমন ভারত বা বঙ্গবাসী নন, কিন্তু বর্তমানে ভারতই তাতে অগ্রণী। তেমনি ইংরেজি বাঙালির ভাষা নয়, কিন্তু যখন যে ভাষা এক বিশ্বভাষায় পরিণত হবে তখন দেখা যাবে তাতেও অগ্রণী বঙ্গভাষীরা। কারণ, সব ভাষার মূলধার তার হাতে। পরমাভাষার সংকেত সে পেয়ে গেছে। সর্বজনীন ভাষাকে সব থেকে ভালো উপায়ে 'রি-ডিজাইন' করার চাবিকাঠিও এখনই তার হাতে এসে গেছে। আজ যে বাধ্য হয়ে ইংরেজি শিখছে কাল সেই ইংরেজি বানাবে ক্রিয়াভিত্তিক বাংলা ভাষার সৌরভ মাখিয়ে। প্রাচীনতর ভারতীয় ভাষাব্যবস্থার ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি মূলত বঙ্গবাসী এবং বঙ্গভাষীর সমানাধিকারের মহাসম্পদ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষার মহামিলনের যোগফলের মধ্যে একটি পরমভাষার সংকেত পাওয়া যাচ্ছে বলে তিনি দেখিয়েছেন।

কিন্তু এই সম্ভাবনা বাংলাভাষীরা নষ্ট করে ফেলতে পারে। যদি, তার ক্রিয়াভিত্তিক-ভাষাভিত্তিক উপলব্ধিকে অবহেলায় ফেলে রাখে এবং অন্য কোনো এশিয় ভাষা যদি তার নিজের মূলাধারে যে ক্রিয়াভিত্তি প্রায় বিস্মৃত অবস্থায় বিদ্যমান, তা ফের আবিষ্কার করে বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে যায়। এই ঘটনা না ঘটলে বাংলাভাষাকে আন্তর্জাতিক ভূমিকা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

সংস্কৃতকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কলিম খান বলছেন, এশিয়াবাসীদের মুখনিঃসৃত, স্বভাবত বিকশিত, তৎকালের প্রচলিত ভাষাকে বা ভাষাগুলো থেকে 'সংস্কৃত' ভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এই ভাষার ভেতর মানবজাতির আদিম প্রাকৃতিক ভাষার উত্তরাধিকার থাকা সম্ভব। সংস্কৃত ভাষাই বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছে। সংস্কৃত বা ভারতের প্রাচীনতর ভাষার বিবর্তিত রূপ বাংলা ভাষা। এর প্রচলনকালে এক জাতি, এক ভাষা থাকার সময়কাল থেকেই–যে কালকে বৈদিক যুগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। দেহের ভেতর যেমন প্রাণ থাকে তেমনি ভাষার ক্রিয়াভিত্তিক বিচূর্ণীভূত হয়ে পৃথিবীর সব প্রতীকী ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তরের কারণ, যতটা-না ভাষাতাত্ত্বিক তারচেয়ে অনেক বেশি সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যাপার।

কলিম খান দেখিয়ে গেছেন, ভাষা অতীতের চিহ্নবাহী। মানুষ যে-যে যুগের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে বর্তমানে এসে পৌঁছায়, সেই সেই যুগের বহু বিলুপ্ত বিষয় মানুষের ভাষায় থেকে যায়।

ভাষায় লুপ্ত বদ্ধমূল ধারণা। একটু বিশ্লেষণ করলেই সেখানেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। প্রাচীন ভারত সমাজে ধনসঞ্চয় বিষয়ে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের বিরাগমূলক ধারণা ছিল। তার প্রমাণ মেলে এখানে, 'সংসারের পাঁকে থাকলেও পাঁকাল মাছের মতো গায়ে পাঁক লাগতে দিয়ো না'। এখনও ধনী মানুষ উল্লেখ করতে গিয়ে এমনও বলা হয়–'ও হলো রাঘব বোয়াল' ধনী যখন গরিবকে গ্রাস করে তখন বলা হয়, 'বড় মাছ ছোট মাছকে এভাবেই খায়; এটাই তো মাৎস্যন্যায়।'

এখানে প্রশ্ন হলো, জলপ্রাণীদের উল্লেখ করা হয় কেন? উত্তর হচ্ছে, আদিম যৌথসমাজের স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত সেকালের সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে তখন 'জল' বলা হতো। আর্থিক অবস্থাভেদে এরা কেউ

বড় আবার কেউ ছোট মৎস্য বিবেচিত হত। প্রাচীন যৌথ সমাজে নগদ-নারায়ণ বা পুঁজির আবির্ভাব হয়েছিল মৎস্য অবতার হিসেবে। 'টাকার কুমির' 'ঘোড়েল', 'রাঘব বোয়াল' প্রভৃতি প্রাচীন ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন আজও বাঙালির ভাষায় থেকে গেছে। ভাষায় ভেসে থাকা স্মৃতিচিহ্নগুলো সরোবরের জলে ভেসে থাকা পদ্মপাতার সাথে তুলনা করেছেন কলিম খান। এই ধারণাগুলোকে তিনি দেখিয়েছেন বদ্ধমূল ধারণা হিসেবে। সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নির্ণায়ক হিসেবেও দেখিয়েছেন বদ্ধমূল ধারণাকেই।

এই ধারণাগুলো অর্থনীতি-রাজনীতি-ইতিহাস-আধ্যাত্মধারণা–এক কথায় সমগ্র সাংস্কৃতির উত্তরাধিকার। বদ্ধমূল ধারণাগুলো টিকে থাকে ভাষা-ব্যবহারকারীদের মনে এটি কী অবস্থায় রয়েছে, তার ওপর। অসামঞ্জস্য সবটুকুই ভাষা ব্যবহারকারী সমাজ ফেলে দেয়। তারপর নির্ধারিত হয় সমকালীন ভাষার চেহারা।

কলিম খান দেখাতে চেয়েছেন, পরম্পরাগতভাবে অজস্র 'বদ্ধমূল-ধারণা' রয়েছে কিন্তু সেগুলো আমরা বুঝবার কৌশল ভুলে গেছি। তারই একটি হলো 'আত্মনং বিদ্ধি' বা 'নিজেকে জানো'। প্রাচীন ভারতের মহর্ষিরা একথা বলে গেছেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য বলছে, 'নো দাইসেলফ'। আমরা বলি 'নিজেকে জানো'। আমিটিকে জানার বিদ্যাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ই সর্বোচ্চ বিদ্যা বলে মনে করেন।

মানুষের অস্তিত্ব যে কত ব্যাপক ও বিস্তৃত তা ভাববার বিষয়। কলিম খানের মতে, মানুষ নিজের ভেতরে সম্পূর্ণ নয়; তার দেহমনের অজস্র চাহিদা বা প্রয়োজন আছে। তাই নিজের বাইরে হাত বাড়াতে হয়। এভাবে মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমানাও পেরিয়ে যায়। মানুষের দেহে সীমাবদ্ধ থাকে না, নেই। মন যেতে পারে না এমন স্থান নেই। মানুষের অস্তিত্ব তাই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরেও। এই যে অসীম মানুষ এই বিদ্যাকেই আধ্যাত্মবিদ্যা বলা হতো। পূর্বপুরুষেরা জগৎটাকে তিনভাগে ভাগ করেছেন প্রয়োজনের জগৎ, অপ্রয়োজনের জগৎ, অতি প্রয়োজনের জগৎ। বিদ্যাও দেখিয়েছেন তিন ভাগে–পরাবিদ্যা, অপরবিদ্যা, পরাৎপরাবিদ্যা।

পরের থেকে যে পর, প্রয়োজনীয় থেকে যে বেশি প্রযোজনীয়, যার পরে আর পর নাই সে 'অপর'। 'অমূল্য' যার কোনো দাম নেই' এবং যার এত দাম যে দেওয়াই যায় না' অপর হলো তাই।

এখানে এসে পাশ্চাত্য ধারণা হোঁচট খায়। এখন যারা ইউরোপের 'other' ধারণাটি 'অপর' নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তারা 'অপর' বিষয়ে বাংলাভাষীর নিজস্ব যে উত্তরাধিকার তা দেখতে পাননি বলে উল্লেখ করেছেন কলিম খান।

তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় সমাজে জাতিভেদের সূত্রপাত হয়েছে ১৯৬২ সালে, ভারত-চীন যুদ্ধের পর। এর আগে, ভারত সমাজের মনের গভীরে তান্ত্রিক-বৈদিক, বৌদ্ধ-হিন্দু, হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-শিখ, হিন্দু-জৈন এবং হিন্দুধর্মের নিজস্ব ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-সহজিয়া-কর্তাভজা ইত্যাদি ভেদ (বদ্ধমূল ধারণা) ছিল। চীনযুদ্ধের পর শক হুণ দল পাঠান মোগল এবং ইংরেজরা ভারত মনন সমাজে ঝড়-ঝাপটা রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। ফলে ভারতের নিজস্ব বদ্ধমূল ধারণা গতিরোধের মুখে পড়ে যায়।

ভারত স্বাধীন হবার পর বহিঃশত্রু যখন স্তিমিত হয়ে গেল তখন নিজের পরিবারের মধ্যেই শুরু হলো সমস্যা। প্রধানত সাহিত্য ও রাজনীতিতে জাতপাতের সমস্যা সমাধানের (প্রতিক্রিয়ামূলক বদ্ধমূল-ধারণার) ডাক দেওয়া হয়। সেই ডাকেই আজকের ভারতে এখানে এসে পৌঁছেছে। পরিস্থিতি এখন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, ভারত-সরোবরের উপরিতলে এখন সূর্যের বা জ্ঞানের আলো আর সরাসরি পড়ে না, নানা জাতের শৈবালে তা আটকে যায়।

এই সমাজ এগিয়েছে কিন্তু পিছিয়েছে সমাজ ব্যবস্থা। প্রাচীন ভারতের মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় নারী ও পুরুষ একে অন্যকে উন্নত হিসেবে বিশ্বাস করত। সভ্যতা বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের ভেতর দিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। বদলে যায় অনেক কিছু। কালে কালে সমাজে অনেক পরিবর্তন আসে-ভারত সমাজেও এসেছে। কিন্তু মর্যাদার প্রশ্নটি মানুষের আদি ও মূল চাহিদা হিসেবেই থেকে গেছে। ধর্মযুদ্ধ থেকে জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ সব কিছুর মূলে মানুষের মর্যাদার চাহিদা। মানুষের মর্যাদার এই দাবি সমাজবিকাশের মূল চালিকাশক্তিরূপে সক্রিয়।

কলিম খান দেখান যে, হিন্দুযুগ সূচনার প্রাক্কালে (৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে), ব্যবসাকে প্রায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পণ্যজীবী ও তাদের সমর্থনকারী প্রায় শতকরা ৮৫ জন ভারতবাসীকে মর্যাদাহীন বলে ঘোষণা করে হিন্দুযুগের সূত্রপাত ঘটানো হয়। সেই মর্যাদা পুনরুদ্ধারের বাসনাতেই ভারতবাসী মোগল ও ইংরেজকে ডেকে আনে কিংবা তাদের আসার পথ প্রশস্ত করে দেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মর্যাদা ফিরে পায় না। এখানে জন্মসূত্রে মানুষকে মর্যাদাহীন ও মর্যাদাপূর্ণ করে রাখা হয়, যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

কলিম খান এবার গ্লোবালাইজেশনের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখান যে, গ্লোবালাইজেশনের বা একাকারের আসন্ন কালখণ্ড মানুষের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সফটওয়্যার উৎপাদনকারী থেকে ধান উৎপাদনকারী সকলকেই সমাজে সমান প্রয়োজন। বাজার সংস্কৃতির বেশ কিছু সমস্যা থাকার পরেও মানুষকে এই সমমর্যাদার নিয়ম শেখাচ্ছে।

কিন্তু শাসনব্যবস্থায় ঘোর অন্ধকার। সেখানে স্থান করে নিয়েছে, সত্যসংকোচ এবং সত্যবিকার। এর মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদী শাসনক্ষমতাগুলো সত্যসংকোচে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে ধনতন্ত্রবাদী, পুঁজিবাদী, গণতন্ত্রবাদী এবং মাল্টিন্যাশনালবাদী শাসকেরা সত্যবিকারে বিশ্বাসী। এর জন্য তারা অসংখ্য ও অজস্র বিজ্ঞানসম্মত এবং আপডেটেড কলাকৌশল প্রয়োগ করছে।

এই যে নিয়ম, এর পেছনে গোপন ভোট ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন কলিম খান। তিনি উন্মুক্ত বা ওপেন ভোট ব্যবস্থাকে প্রচলনের কথা জোর দিয়ে বলেছেন। যাতে করে জনপ্রতিনিধিরা তাদের নির্বাচকদের সামগ্রিক অর্থে ইকো সিস্টেমের সঙ্গে জড়িত মানুষ থেকে ধূলিকণার জন্য কল্যাণকর হয়ে উঠতে পারেন। তারা যেন প্রকৃত অর্থে 'হিরের টুকরো' হয়ে উঠতে পারেন। বিশ্বায়ন দাবি জানাচ্ছে স্বচ্ছতার।

অথচ এই ভারতীয় সমাজেই পূর্বজনেরা 'বিশ্বায়ন' দেখেছিলেন। তারা একে নাম দিয়েছিলেন 'একার্ণব'। কলিম খান দেখালেন যে, মৎস্যাবতারের প্রলয়কালে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীগুলো যখন একত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন তারা তখন বিশ্বায়ন দেখেছিলেন। পুরাণাদি অনুযায়ী, বিশ্বায়নের ফলাফল প্রথমে শুভ পরে অত্যন্ত অশুভ।

এই জোয়ারে ভাসছে মানুষ। না ভেসে উপায় নেই। কারও কর্মবিমুখ হয়ে বেঁচে থাকার পরিবেশ অবশিষ্ট নেই। দেওয়া আর নেওয়ার এখন মহোৎসব। সাহিত্য-সাহিত্যিক, রাজনীতি-রাজনীতিবিদ কেউই আর 'নরই নারায়ণ' কিংবা 'যত্র জীব তত্র শিব'-এর গান গাইছেন না। পণ্যস্রোত, সেবাস্রোত, মজাস্রোত, আর মেধাস্রোতে গা-ভাসানোকেই সঠিক মনে করেছেন তারা। কিন্তু যখন এই জোয়ার থেমে যাবে, জল নেমে যাবে তখন কি হবে? মনে রাখা দরকার এই যাবৎ যা দেখা গেছে, বেশিরভাগ সময়ই 'ক্রমক্ষীয়মাণ নীতি' মান্য করে চলেছে সব ঝড়। সামাজিক ঝড়গুলোর জীবৎকাল প্রথমত ৫০০ বছর টিকতো পরবর্তীতে সেই ঝড়ের আয়ুষ্কাল হয়ে গেছে ২৫০ বছর, আরও পরে ১০০ বছর। সমাজতন্ত্রের ঝড়ো হাওয়া ৫০ বছরও টেকেনি।

এই সময়ের ঝড়ের নাম বিশ্বায়ন। ১৯৯৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে এই ঝড়। গড়ে উঠেছে পরস্পরনির্ভরতা। স্রোতটা কেটে গেলেই 'ডিসকানেক্টেড' হয়ে যাব আমরা। বিদেশগামী পণ্য-সেবা- মেধা-মজা সব, সবকিছুই শ্মশান আর গোরস্থানের দিকে মিছিল করবে।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবাসী আবিষ্কার করে গেছেন, প্রাবণ-কালের (বিশ্বায়নের) মন্ত্র। তারা দেখিয়ে গেছেন যে, মানবদেহের গ্রহণ-বর্জনই সমাজদেহের আমদানি ও রপ্তানি। অভাবের বস্তুগুলিকে বাইরে থেকে আনা হয় এবং উৎপন্নের উদ্বৃত্তকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া সমাজশরীরের গ্রহণ-বর্জন। এটির পরিমাণ যত কমানো যাবে, সমাজশরীরের কাঠামোটি ততই দীর্ঘজীবী হবে। তার অর্থ দাঁড়ায়, সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ এমনভাবে চালাতে হবে যাতে করে উদ্বৃত্ত না হয়, অভাবও না হয়। ঠিক থাকে যেন সমাজদেহের গ্রহণ-বর্জনের মাত্রা।

বলা যায়, প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ ও বিস্মৃত অতল থেকে তুলে এনেছেন আত্মশক্তির উৎসসমূহ। সেখানে দাঁড়িয়েই বলে গেছেন, বিশ্বায়নের জোয়ারের জল নেমে গেলে কীভাবে টিকে থাকতে হবে তার পূর্বাভাস। •

স্বরলিপি ॥ কবি ও সাংবাদিক

নবারুণ ভট্টাচার্য

নবারুণ ভট্টাচার্যের আখ্যান

ঋভু চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

উপন্যাস শব্দটি ইংরেজি Novel শব্দের পরিভাষা রূপে গৃহীত হলেও এর অর্থ বাক্যারম্ভ (উপ-নি-অস্+ঘঞ+ভাব)। আমরা সাধারণভাবে উপন্যাস বলতে গদ্যে লিখিত একটি দীর্ঘ কোনো উপস্থাপনাকে বুঝি, যার বিশাল পটভূমিতে ফুটে ওঠে সমাজ ও মানবজীবনের বিভিন্ন আখ্যান। বর্তমানে বাংলাতে উপন্যাস নামে আমরা ঠিক যাকে বুঝি এর চর্চা তুলনামূলক নতুন হলেও রামায়ণ, মহাভারত এমনকি বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও বীজ লুকিয়ে আছে। তবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'নববাবুবিলাস' নামক ব্যাঙ্গাত্মক রচনার মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। এরপর ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও প্যারিচাঁদ মিত্রের হাত ধরে বাংলা উপন্যাস লেখা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়। বাংলা ভাষাতে এরপর বহু উপন্যাস লেখা হয়। কোনোটি সামাজিক, কোনোটি আঞ্চলিক, কোনোটি আত্মজীবনীমূলক, কোনোটি মনস্তাত্ত্বিক

সমাজে নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়েও বাংলাতে বহু উপন্যাস লেখা হয়েছে, এই প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ থেকে কমলকুমার মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের নাম করা যায়। এরপর বাংলা উপন্যাসের পটভূমিতে নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ, এমনকি বামপন্থাও বাংলা উপন্যাসের বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু যাকে নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনিই একমাত্র বাংলা ঔপন্যাসিক যাকে নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক কোনোটার শেষ নেই। তাঁর উপন্যাসের শৈলী তিনিই শুরু করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর সাথেই এই শৈলী হয়তো শেষও হয়ে গেছে। আমি নবারুণ ভট্টাচার্যের কথা বলছি।

বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ভার্জিনিয়া উল্ফ তাঁর 'Modern Fiction in The Common Reader' লিখেছেন Life is not a series of gig lamps symmetrically arranged, life is luminous holo, a semi transparent envelope. এই প্রসঙ্গে অবশ্য Elizabeth Bowen এর কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি তাঁর 'Notes on writing a Novel' গ্রন্থে লিখেছিলেন উপন্যাসের কোনো চরিত্রই ঔপন্যাসিকের তৈরি নয়, হয় খুঁজে বের করা, না হয় আগে থেকে মনের ভিতর থাকা, যা লেখার সাথে বেরিয়ে আসে। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র রাউন্ড চরিত্র হবে। নবারুণের লেখার মধ্যেও এই এনভেলপের উপস্থিতি লক্ষ করি যা পাঠকদের মুহূর্তের মধ্যে একটা ট্রান্সের মধ্যে নিয়ে যায়।

বিজন ভট্টাচার্য ও মহাশ্বেতা দেবীর একমাত্র সন্তান নবারুণ ভট্টাচার্যের জন্ম মুর্শিদাবাদে, পড়াশোনা বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল ও আশুতোষ কলেজে। প্রথমে ভূতত্ত্ব নিয়ে ভর্তি হলেও পরে সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর বিদেশি সংবাদপত্রের অফিসে কাজ আরম্ভ করেন, বেশ কিছু বছর কাজও করেন (১৯৭৩-১৯৯১)। বিষ্ণু দের 'সাহিত্য পত্র' কিছু দিন সম্পাদনার পর ২০০৩ সাল থেকে সম্পাদনা করতে আরম্ভ করেন 'ভাষাবন্ধন' পত্রিকাটি। নাটক ও কথাসাহিত্যের আবহে বেড়ে উঠলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম পা রাখা কবি হিসাবে। ১৯৬৮ সালে পরিচয় পত্রিকায় তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'ভাসান' প্রকাশিত হয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' হিন্দিতেও অনুবাদ হয়, তাই হিন্দি ভাষার মানুষ তাঁর লেখা সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন। তাঁর 'হালাল ঝাণ্ডা' (১৯৮৭) বইয়ের সূত্রেও অন্য ভাষার পাঠকদের কাছে তাঁর পরিচিতি ছিল। প্রথম কবিতার বই দিয়ে সাহিত্য প্রকাশ শুরু হলেও কথাসাহিত্যে তাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ১৯৯৩ সালের প্রথম দিকে 'হারবার্ট' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর। স্বয়ং শঙ্খ ঘোষ তাঁর এক লেখায় বলেন, 'গত পাঁচ বছরের মধ্যে এটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।' দেবেশ রায় বলেন, 'এই একটা উপন্যাসেই প্রমাণ হয়ে গেছে নবারুণ একজন জাত ঔপন্যাসিক।'

এই উপন্যাসের জন্যে তিনি নরসিংহ দাস পুরস্কার (১৯৯৪), বঙ্কিম পুরস্কার (১৯৯৬), সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার (১৯৯৭) পান। এই উপন্যাসকে কেন্দ্র করে নাটক ও সিনেমা তৈরি হয়েছে।

তাঁর লেখাতে বারবার বিভিন্ন রকমের ঝুঁকি নেওয়ার বিষয়টি ফুটে ওঠে। চোখের সামনে একদিকে যেমন নকশাল আন্দোলন দেখেছেন অন্য দিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন। হয়তো তাই নির্মমভাবে বলতে পারেন, 'যে পিতা তার সন্তানের লাশকে শনাক্ত করতে ভয় পায়, আমি তাকে ঘৃণা করি।' এই বাংলায় যখন নকশাল আন্দোলন, ঐ বাংলায় তখন সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন চলছে। দুটো ক্ষেত্রেই শাসক ও শোষকের চরিত্র এক। নবারুণ তাঁর নিজের লেখাকে রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিসমের অংশ মনে করতেন। তিনি বলতেন, 'কাফকা আমার কাছে একটা ল্যাবরেটরি।' 'যে তাগিদ থেকে আমি লিখি তার সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে।' তাঁর উপন্যাস সমগ্রের ভূমিকাতে ঠিক এভাবেই নিজের ঔপন্যাসিক সত্তাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে সমস্ত পাঠকের কাছে অনুরোধও করেছেন, 'আমার আখ্যান (উপন্যাস নয়) তার ব্যর্থতা ও সফলতার পাশে লেখাগুলির সাথে কোনো রাজনৈতিক যোগসূত্র আছে কিনা...' সেগুলিও বিচার করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'ভালো ফুটবল খেলতে পারলে এলাইনে আসতাম না।' এবং 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বড় হয়েছিলেন বঞ্চিত নিপিড়িত মানুষের মধ্যে। হয়তো এই জন্যেই চিরকাল ঘৃণা করেছেন সাহিত্যের নামে ঢ্যামনামিকে, ঘেণ্না করেছেন সেই সব মানুষরূপী রাক্ষসদের যারা কারখানার জমি কেড়ে হাজার হাজার মানুষের পেটে লাথি মেরে আকাশচুম্বি ইমারত তৈরি করে তার ভেতরে থাকে, আর সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিক কৃষকদের গুণ্ডা বা বেশ্যা হতে বাধ্য করে। নবারুণ বারবার তাদের হয়েই কলম ধরতে চেয়েছেন, কারণ তাঁর মতে লেখক কোনো দিন চিয়ারলিয়ার নয়। তাঁর 'হারবার্ট' প্রকাশিত হয় 'প্রমা' পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। সম্ভবত প্রকাশক সুরজিৎ ঘোষের ব্যক্তিগত উৎসাহে। শোনা যায় শঙ্খ ঘোষ ও দেবেশ রায়ের পাশে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটি পছন্দ করেন, এমনকি সেই সময় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কলকাতার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন থাকবার সময় 'হারবার্ট' পড়েন। উপন্যাসটির সব থেকে চমকপ্রদ বিষয় হলো শহুরে খিস্তি ও রাস্তার কথাবার্তার সাথে সেই সময়কার যুক্ত, নব্বই এর দশকের আধ্যাত্মিকতা। উপন্যাসটি শুরু হয় বিজয় চন্দ্র মজুমদারের একটি কবিতার দুটি লাইন দিয়ে, 'চরণে বন্ধন নাই, পরানে স্পন্দন নাই/ নির্বাণে জাগিয়া থাকি স্থির চেতনায়', এরপর প্রতিটি পরিচ্ছেদে এরকম আরো কবিতার ছোট ছোট অংশের ব্যবহার আমরা পাই, এবং অদ্ভুত ব্যাপার হলো সমগ্র উপন্যাসের আত্মার সাথে এই পঙ্‌ক্তিগুলির একটা যোগসূত্র আছে। যদিও একটি সাক্ষাৎকারে নবারুণ নিজে বলেছেন, 'আমি অত কিছু ভেবে চিন্তে লিখিনি।'

'হারবার্টের' হিন্দি অনুবাদ করেন মুনমুন সরকার ও ইংরেজিতে অনুবাদ করেন জ্যোতি পঞ্জোয়াতি। নবারুণ নিজে লিখেছেন, 'হারবার্ট লেখার সময় দুনিয়ার বামপন্থার শোচনীয় অবস্থা ছিল।'

মুশকিল হলো উপন্যাসটি সিনেমা হয়ে নন্দন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির সময় বেশ জটিলতা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। নবারুণের দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভোগী' ১৯৯৩ সালে 'বারোমাস' শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ২০০৭ সালে 'অটো ও ভোগী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'অটো' উপন্যাসের সাথে। দুই উপন্যাসেই নবারুণ তুলে আনেন এক নেমেসিস, দেখা যায় এই মৃত্যু উপত্যকায় মানুষ নামের চরিত্রের কেবল দুটিই চরিত্র হতে পারে নিঃশব্দ ঘাতক অথবা পরাজিতের। ভোগী উপন্যাসটি এই সমাজের ভোগ বিলাস ও সাধারণভাবে বেঁচে থাকবার একটা দ্বন্দ্ব। যার মূল বিষয় হলো, 'অল আউট কোরাপসন এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে সোসাইটির চেষ্টা।' ভোগী এই সমাজ থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, 'যাওয়ার সময় পুঁটুলিটা নালার জলে ফেলে দেয়। কিছুটা ঘোলা জল হাতে নিয়ে মাথায় দেয়।' ভোগী যাকে মিথিল নিয়ে বাইরে বের হয় ও পরিচয় দেয়, 'কি বলব, সাধুসন্তের মতোই মানুষ, নাম হলো ভোগী।' এই ভোগী অটো ড্রাইভারের গালিগালাজ শুনে আনন্দ পায়, অথচ 'সব আগে থেকে বুঝতে পারে।' নবারুণের আরো অনেক উপন্যাসের মতো এখানেও কবিতার ব্যবহার বেশ প্রাসঙ্গিক। এই কবিতা কখনও মিমির সনেট, 'সঙ্গমরত টিরানো সোরাস/কম্ভোম দিয়ে করে প্রাতরাশ।' অথবা 'ডাইনে আল্লার তলোয়ার/বামেতে মহম্মদের ঢাল।' কখনও বা এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' কবিতার প্রসঙ্গও টানা হয়। উপন্যাসের বিষয়টিকে নবারুণ এক কথায় বলেছেন, 'ক্যাপিটালের সাথে হিউমানিটির লড়াই।' তবে শেষটি বেশ অদ্ভুত, অ্যাবরাপ্ট, একটা সিনেমাটোগ্রাফিক পরিবেশে উপন্যাসটি শেষ হয়।

১৯৯৬ সালে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পাশে উপন্যাসটি মঞ্চস্থও হয়। 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' উপন্যাসের মূল বক্তব্য, 'সমাজতন্ত্রের জন্য রাস্তায় গরিব ভিখিরি ও কোনো প্রাণীর উৎসাহ থাকলেও যুদ্ধ হচ্ছে না।' উপন্যাসটির প্রথাগত কোনো কাহিনি নেই, আছে কিছু আখ্যানমূলক বর্ণনা। মূল চরিত্র রণজয়। নকশাল আন্দোলনের সাথে যুক্ত, স্বপ্ন দেখে আবার অ্যাসাইলামেও থাকতে হয়। উপন্যাসটিতে সত্তর দশকের কলকাতার বাস্তব অবস্থাটির বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও বর্ণনাটি খণ্ড খণ্ড ভাবে করা।

১৯৯৮ সালে 'তথ্যকেন্দ্র' পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নবারুণ বলেন, 'শারদীয়ার লেখালেখি নিয়ে আমি খুব একটা ব্যস্ত

থাকি না। তবে আগামী পুজোতে 'প্রতিদিন' এ একটা উপন্যাস লেখার কথা আছে।' এই লেখাটি হলো 'খেলনানগর'। খেলনা আর পুতুল ঘিরে ৪৮৭ জন মানুষের এক উপনিবেশ সেখানে যেমন প্রেমিক প্রেমিকা থাকে তেমনিই থাকে উইন্ডচিটার নামে এক বহিরাগত। উপন্যাসটি আমাদের অনিশ্চয়তায় ভরা এক সময়ের চাকার সামনে দাঁড় করায়, যেখানে প্রতিমুহূর্তে আমাদের লড়াই করে যেতে হয়। এই উপন্যাসটি প্রকাশ পাওয়ার আগেই সুশীল গুপ্তার মাধ্যমে হিন্দিতে অনুবাদ হয়। নবারুণ এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নির্মমতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। 'খেলনা নগর' উপন্যাসটি নবারুণের অন্যান্য উপন্যাসের মতই ভোগবাদ আর সমাজবাদ দ্বন্দ্ব। এখানে লরিতে ক্লিনার হিসেবে কাজ করতে আসা কুমার প্রেমে পড়ে জিশার। সেই সঙ্গে উপস্থিত হয় উইন্ডচিটার, যার আসল পরিচয় জানা যায় না, আরো কিছু চরিত্র থাকে যাদের ৮/৯ বলে সম্বোধন করা হয়। 'খেলনানগর' আদপে একটি কারখানা, যে কারখানাটির ওপর নিউট্রন বোমা পড়ে, যাকে কেউ কেউ 'ক্যাপিটালিস্ট বম্ব বলে।' এই উপন্যাসেও নবারুণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মতামতটি খুব স্পষ্ট, তাই তিনি লেখেন, 'বড়লোকের দেশে এসব আবর্জনা তৈরি করলেও জমতে দেয় না, গরিব দেশগুলোতে পাচার করে দেয়।' আসলে এই সাম্রাজ্যবাদের কাছে বাকি পৃথিবী একটা খেলনানগর মাত্র।

তাঁর প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস হলো 'কাঙাল মালসাট'। এটিই লেখকের সব থেকে বড় উপন্যাস। প্রায় ১৮টি পরিচ্ছেদে এটি প্রকাশিত হয়, এমনকি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়েও শেষ তিনটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত হয়, তারপর ২০০৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে ধারাবাহিকভাবে 'ভাষাবন্ধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখক সচেতনভাবে একটি অন্য ধরনের নির্মাণ কৌশল ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজে বলেছেন 'ডায়ালগের উপর জোর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, তার সাথে আছে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা।' উপন্যাসটিতে জাদুবাস্তবতার আড়ালে অন্য আরেক আখ্যানের জন্ম দেয়। সমাজব্যবস্থা, বাস্তবতা, মিডিয়া তৎকালীন শাসক সবের মাঝে তৈরি হওয়া নেক্সাস কিভাবে একটি মানসিক বিদ্রোহের জন্ম দেয় তারই দলিল এই উপন্যাস। আমরা বেশ কিছু অদ্ভুত চরিত্র পাই, যেমন ফ্যাতাড়ু, চোক্তার। এই উপন্যাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো বাংলা অপশব্দের বহুল ব্যবহার। অবশ্য শ্রী দেবেশ রায় উপন্যাসটির মধ্যে একটি অচেতন স্থূলতা লক্ষ করেছেন।

'আমার যেমন অধিকার আছে, মশারও অধিকার আছে আমাকে কামড়াবার।' লুব্ধক উপন্যাস প্রসঙ্গে এটিই ছিল নবারুণের ভাবনা। উপন্যাসটি 'দিশা' সাহিত্য পত্রিকার শারদা ১৪০৭ (২০০৩) সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 'ইউ.এস সার্জিকাল কর্পোরেশন নামের একটি সংস্থা শল্য চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ ধরনের স্টেপলার বানাত, তা কতটা কার্যকর কতটা সেটা দেখানোর জন্য জীবন্ত কুকুরদের ব্যবহার করা হত।' এই উপন্যাসটির বিষয় সেই ভাবনা থেকেই নেওয়া। অনেকে এই উপন্যাসটিকেই নবারুণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেন। বিষয়বস্তু কলকাতা শহর থেকে নেড়ি কুকুরদের উৎপাটন। চরিত্র কয়েকটি নেড়ি কুকুর, যাদের নাম 'কান গজানো', 'সাদাটে', পাটকিলে। এদের কারোর গায়ে অ্যাসিড ছুড়ে মারা হয়, কেউ মারা যায় অ্যাক্সিডেন্টে, কারোর বাচ্চাদের অত্যাচার করা হয়। কুকুর মারবার বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়, যেগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হিটলার তার নাৎসি জমানায় প্রয়োগ করেছিলেন, এমনকি শেষ দিকে দেখা যায় কাজ না করলে বা শারীরিক শক্তি না থাকলে মানুষ ও কুকুর কারোর কোনো পার্থক্য হয় না। তাই বয়সকালে বড় লোকের বাড়ির পোষা জিপসি আর রাস্তার নেড়ির কানগজানোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আবার প্রয়োজনে কুকুর বিড়াল উভয়ে উভয়ের বন্ধু হয়ে যেতে পারে। আসলে উপন্যাসটি একটি প্যারবেল, যেখানে নবারুণ মানুষের নিরাপত্তাহীনতা, আশাহীনতাকে এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ, 'মানুষ আর কুকুরের মধ্যে স্নায়বিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি যদি অভিন্ন হয়।' এই উপন্যাসেও আমরা বেশ কিছু কবিতার উল্লেখ পাই। 'অলৌকিক ভিক্ষাপাত্রের মত চাঁদ/দাঁতে কামড়ে ছুটে যাচ্ছে রাতের কুকুর।' অথবা 'রাস্তায় মানচিত্র হয়ে ঘুমায় কয়েকটি ক্লান্ত কুকুর।' কবিতার পাশে 'চেগুয়েভারার দিনলিপি' এমনকি 'নৈষ্কর্মা সিদ্ধিতে' মানুষের সাথে কুকুরের সমগোত্র বিষয়ে একটি শোকেরও ব্যবহার করেন। সেই সঙ্গে উল্লেখ করেন শাটলবক্স পরীক্ষা ও লাইকা প্রসঙ্গ।

'আজকাল' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় এই 'অটো' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে। পরে 'অটো' ও ভোগী গ্রন্থাকারে একসাথে প্রকাশিত হয়। 'অটো' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র চন্দন, ভাড়ার অটো চালায়, অন্য দিকে অটো আটকে দুষ্কৃতি ধরে, ঝগড়া ঝামেলা করে, গুলিও করে, নেশা করে। তার সঙ্গে থাকে আরো কয়েকটি চরিত্র, যেমন মিউচুয়াল ম্যান, চন্দনের বউ মালা, হেডব্যান্ড। চন্দনকে তার সমাজে সবাই ধ্বজো বলে ডাকে। উপন্যাসটিতে আমরা এই সমাজের ঝুপসি (কম আলো তবে অন্ধকার নয়) জীবনের সাথে পরিচিত হবার সাথে এই সমাজকে নতুনভাবে দেখতে পাই।

নবারুণের 'মসোলিয়াম' উপন্যাসটি অন্য ধরনের উপন্যাস হলেও অনেকেই এর সাথে 'কাঙাল মালসাটের' মিল পান। উপন্যাসটির আঙ্গিকে জাদুবাস্তবতার অনন্য ব্যবহার পাঠকের মন কাড়ে। সেই সঙ্গে আছে তীব্র স্যাটায়ার। সমাজের সব স্তরে যেভাবে অবনমন হয়েছে তার একটি জ্যান্ত দলিল এই উপন্যাস। নবারুণের অন্য উপন্যাসের মতো এখানেও বেশ কয়েকটি কবিতার ব্যবহার হয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে খিস্তির ব্যবহার। তবে এই উপন্যাসে এই খিস্তির ব্যবহার খুব বেশি মাত্রায় বেশি। স্যাটায়ারের তীব্র ফলাতে কখনও বিদ্ধ হয় সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণি। তাই কবি পুরন্দর ভাট, 'বাল সিরিজের' কবিতা লেখে, সাপ্তাহিক 'ভ্যামপায়ার' পত্রিকা এক হাজারটি কপি প্রকাশিত হলেও মাত্র তিন কপি বিক্রি হয়, অথচ প্রচুর বিজ্ঞাপন জোগাড় করে। রাজনৈতিক দলগুলি নিজের নিজের অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ হাইকমান্ডের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে, কেউ বা মমির ভিতর হিন্দুত্ব খোঁজে। অন্যদিকে পোকামাকড় সমগোত্রীয় বাঙালি শুধু সুযোগ খুঁজতেই ব্যস্ত থাকে।

এই জাতীয় লেখাগুলো কেন লেখেন এই প্রশ্নের উত্তরে নবারুণের কৈফিয়ৎ ছিল, 'আমি একটু আমোদ গেঁড়ে আছি। হাজার দুঃখ, হাজার কষ্টের মধ্যেও মানুষকে যেভাবে আনন্দের সন্ধান করতে দেখেছি, কিন্তু এই যে এত লোক আনন্দ করছে, আমি হয়তো তাদের মতো করে আনন্দ করতে পারি না। ....' এখান থেকেই উপন্যাসটির সৃষ্টি। নবারুণ নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন 'ডেভেলপমেন্ট তত্ত্বে আমি ঠিক বিশ্বাস করি না।' তাহলে তাঁর উপন্যাস কি হালফিলের যে সামাজিক উন্নয়ন তার বিরুদ্ধে। যে সমাজের, যে মানুষের অধিকারের কথা মহাশ্বেতা দেবী বলে গেছেন তাঁর উপন্যাসও কি ঘুরিয়ে সেই অধিকারের কথাই বলে? এই জন্যেই হয়তো 'কাঙাল মালসাট' উপন্যাসে লেখেন, 'তুমি যদি জাত ক্যাওড়া না হতে তোমাকে আমি ফ্যাতুড়ু করতুম?'

মনস্তত্ব বলে মানুষ তার হতাশা থেকে খিস্তি দেয়। নবারুণও তাঁর উপন্যাসে এই শহুরে মানুষের হতাশা ও খিস্তিকে তুলে আনেন, তুলে আনেন মানুষের ভিতরে বিপ্লবী সত্তাকে। আসলে নবারুণের মতে একটা যুগের পরিবর্তনে আরেকটি যুগ আসে, এই পরিবর্তন সব সময় খুব একটা সহজভাবে হয় না, কখনও সব কিছু ভেঙে দেয়, এই ভেঙে দেওয়াটাকেই অনেকে বিপ্লব বলেন। সারা জীবন লেখার মাধ্যমে নিজের সাথেও সমাজের সাথে এই বিপ্লবকেই করতে চেয়েছে, করাতে চেয়েছেন। তিনি সারা জীবন বিশ্বাস করে এসেছেন, লেখকদের দায়টা অনেক বেশি ঘুমন্ত পাঠকদের জাগানোর দায়িত্ব লেখকদের। তাঁর মা মহাশ্বেতা দেবী ও বাবা বিজন ভট্টাচার্যের মতো এই কাজ করতে গিয়ে অনেক রকম সমস্যা ও সমালোচনাতে পড়তে হয়েছে। কিন্তু নবারুণ তাঁর নিজের জায়গাতেই থাকেন। সেই জন্যেই যতদিন বাংলা উপন্যাস থাকবে ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন বাঙালি পাঠকের হৃদয়ে। •

ঋণ

১) উপন্যাসসমগ্র : নবারুণ ভট্টাচার্য, দেজ পাবলিকেশন ২) banglalive.com (সাহিত্য আর বিপ্লব : নবারুণ ভট্টাচার্য) ৩) ওনার ব্যক্তিগত কথাবার্তা ৪) ইন্টারনেট ৫) কিছু পত্রপত্রিকা।

ঋভু চট্টোপাধ্যায় ॥ প্রাবন্ধিক

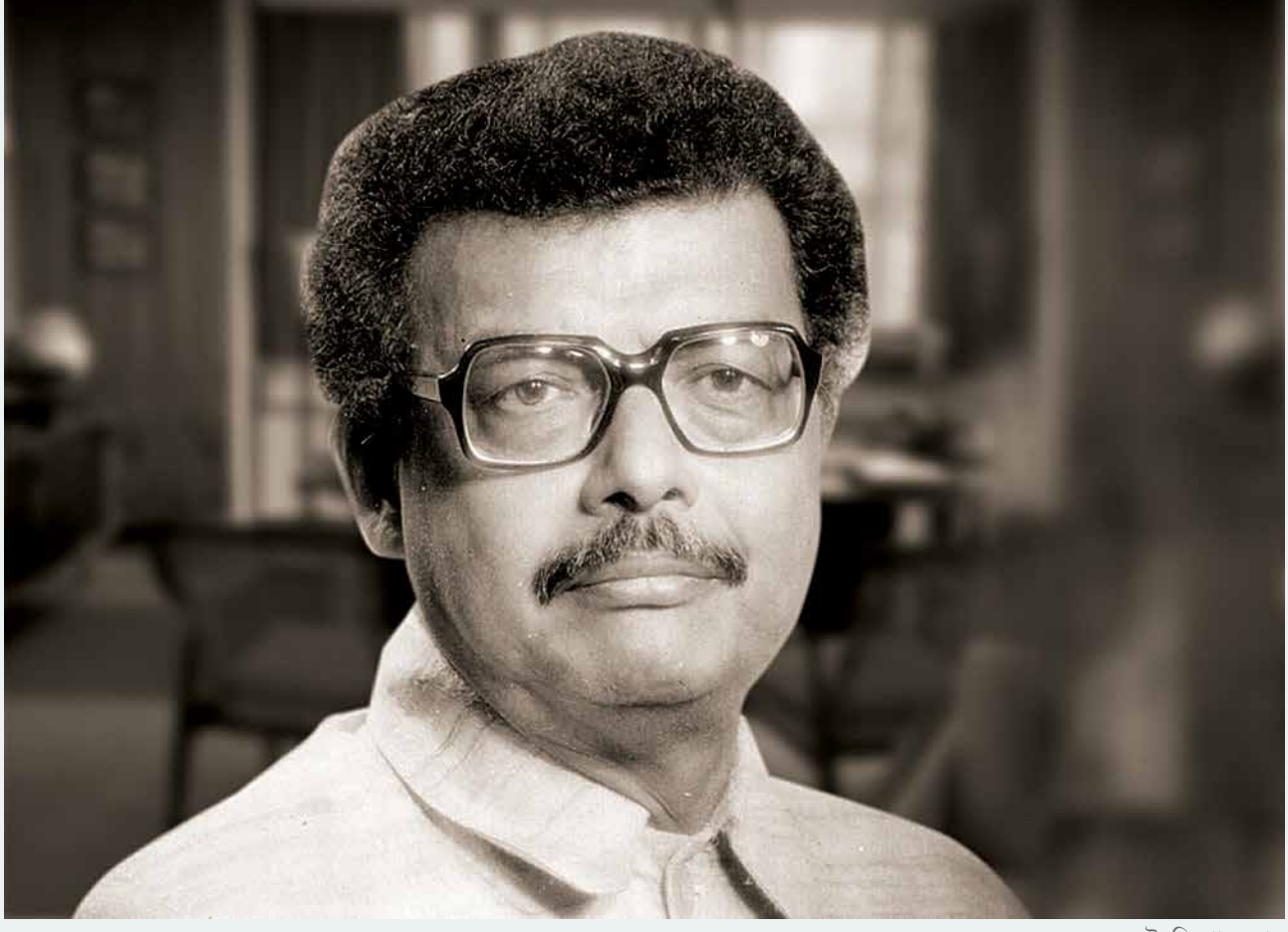

গৌরকিশোর ঘোষ

জন্মশতবর্ষ

শতবর্ষে গৌরকিশোর ঘোষ

ঈশিতা ভাদুড়ী

গৌরকিশোর ঘোষের দেশ মাটি মানুষ নিয়ে তিন খণ্ডে লেখা এপিক ট্রিলজি–'জল পড়ে পাতা নড়ে', 'প্রেম নেই' আর 'প্রতিবেশী' যদিও তিনটি স্বতন্ত্র উপন্যাস, কিন্তু মূলত একই উপন্যাসের পৃথক খণ্ড মাত্র। এই ত্রয়ী উপন্যাসের জন্য ১৯২২ থেকে ১৯৪৬ এই পঁচিশ বছর সময়কালকে নির্বাচন করেছিলেন লেখক, এই সময় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিবর্তন, দেশবিভাগের ট্র্যাজেডি নিয়ে ভারত তথা বাংলার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। লেখকের অভিপ্রায় ছিল এই তিনটি উপন্যাসের মাধ্যমে সেইসব ক্রমপরিবর্তন ও ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরা। প্রথম খণ্ড 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-র কাহিনির সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ড 'প্রেম নেই'-এর কাহিনির কিছুটা ধারাবাহিকতা থাকলেও তৃতীয় খণ্ডের কাহিনি কিন্তু সম্পূর্ণই ভিন্ন

তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক পটে দাঁড়িয়ে সমাজকে বিভিন্নভাবে নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। তাঁর 'প্রতিবেশী' গ্রন্থের ভূমিকায় গৌরী আইয়ুব লিখেছিলেন, 'তিনটি খণ্ডেরই মূল বিষয়টি একই, অর্থাৎ বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং পঁচিশ বছরে তার বিবর্তন। যা গোড়ায় ছিল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাত সেটাই কী করে ক্রমে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পৌঁছে দেশকে খণ্ড খণ্ড করল তারই বস্তুনিষ্ঠ সহৃদয় চিত্রণ। ভারত-ইতিহাসের এই সুপরিচিত ট্র্যাজিডি গৌরের উপন্যাসেও দুটি মানব-মানবীর ব্যক্তিগত ট্র্যাজিডিতে পরিণত হয়েছে তৃতীয় খণ্ডে এসে।"

'জল পড়ে পাতা নড়ে' উপন্যাসের শুরু ১৯২২ সালে। সেই সময় গ্রাম থেকে হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের অনেকেই শহরে চলে যাচ্ছে জীবিকার সন্ধানে। সেরকমই এক পরিবারকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস। একদিকে গ্রামীণ নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রেম-ভালোবাসা, আশা-নিরাশা, দ্বেষ-বিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা-সংস্কার, আবার অন্যদিকে নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমান পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েন চিত্রিত হয়েছে এই উপন্যাসে। ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৬ সাল, এই চার বছর এই উপন্যাসের কালপর্ব। দুটি পর্বে বিন্যস্ত এই উপন্যাসের প্রথম পর্ব 'দুরন্ত ধারা'তে দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে ঘিরে নেতৃবর্গের বিভিন্ন চুক্তি আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের রাজনৈতিক ভূমিকার পাশাপাশি গ্রামের পরিবারবর্গের ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বিভিন্ন অধ্যায় বিবৃত হয়েছে। পরবর্তী পর্ব 'হাওয়া এলোমেলো'র বিষয় নানা রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতভেদ, জোরালো স্বাধীনতা-আন্দোলন, চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু, ইংরেজদেরকে হিন্দু-মুসলমানের তোষণ, পণপ্রথা ইত্যাদি।

এই জীবনধর্মী উপন্যাসের মূল চরিত্র মেজকর্তা গ্রামে বসবাস করেন,

যদিও লেখাপড়া করেছেন কলকাতায়। মনে-প্রাণে অসাম্প্রদায়িক, গ্রামের এবং নিজের পরিবারের মানুষদের সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবে ভীত। চিত্তরঞ্জন দাশ যখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা করছেন, সেই সময় মেজকর্তাও চেয়েছিলেন সকলের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে, অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করতে, চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। তবুও মেজকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে তিনি মুসলমানদের পক্ষে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ডাকে যেমন হিন্দুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিতে পারেনি, সেরকমই উপন্যাসের মেজকর্তার মাধ্যমে লেখক বলেছেন দেশোদ্ধার সহজ নয়। লেখকের শানিত লেখনীতে ফুটে উঠেছে পারিবারিক-জীবনের সঙ্গে সামাজিক-জীবনের অন্তর্মুখী ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, স্বদেশী, সন্ত্রাসবাদ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সবই রয়েছে।

এই ত্রয়ী উপন্যাসের দ্বিতীয় উপন্যাস 'প্রেম নেই' সর্বাধিক জনপ্রিয়, তিনটি পর্বে রচিত, 'আওরেতে হাসিনা', 'মধ্যিখানে চর', 'দিগন্তে কালবৈশাখী'। ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট 'প্রেম নেই' উপন্যাসে। এখানে মুসলমান জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানাভাবে আলোকপাত করেছেন লেখক। সুদীর্ঘ সময় ধরে একত্রে থেকেও হিন্দু-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে যে তেমন কোনো বোঝাপড়া হয়নি, সেই বিষয়টিকে নিবিড়ভাবে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ এবং সেই চিত্রটি তিনি সযত্নে আঁকার চেষ্টা করেছিলেন। মুসলমান সমাজের আলো-ছায়া আর হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অসামান্যভাবে তুলে ধরেছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিধ্বংসীর ছবিগুলোও। ভালোবাসার অভাব থেকেই এই উপন্যাসের নামকরণ করেছেন লেখক, 'প্রেম নেই'। জীবনযাপনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কিভাবে প্রবেশ করেছে, তার সন্ধান করেছেন লেখক, ধর্মের মধ্যে ছিদ্রান্বেষণও করেছেন। হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ, আবার নগরকেন্দ্রিক ও গ্রাম্য মানুষের চিত্র এমন আন্তরিক ও নিপুণভাবে এঁকেছেন, এবং সম্পর্কের অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রেম, সংঘাত, রাজনৈতিক চেতনাকে স্পষ্ট করেছেন, তৎকালীন সমাজকে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধে হয় না।

'টগর কাঁখ থেকেই ঘড়া উপুড় করে ঘড়ার জল ফেলে দিতে লাগল। বিলকিস করুণ চোখে দেখতে লাগল টগরের ঘড়ার জল গড়গড় করে গড়িয়ে এসে ওদের দুজনের মাঝখানে কেমন মোটা একটা দাগ কেটে নদীর দিকেই নেমে যাচ্ছে'– গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' উপন্যাসে বিশ্বাস বাড়ির ছোট মেয়ে টগর আর হাজি সাহেবের মেয়ে বিলকিস একে অন্যকে 'গোলাপ ফুল' পাতায়। সুগন্ধি সাবান নিজের হাতেই ঘষে দেয় বিলকিসের চুলে, নদীর ঘাটে দুই বন্ধুর বাক্যালাপ চলে। টগর আর বিলকিসের একে অন্যের প্রতি যতই অকৃত্রিম আগ্রহ এবং আন্তরিকতা থাকুক, কিন্তু সমাজ সেখানে অস্পৃশ্যতার গণ্ডি এঁকে দেয় ধর্মের নামে। টগরকে ঘড়া থেকে ফেলে দিতে হয় পুজোর জল, কেননা সে-জল বিলকিস ছুঁয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের যে বিভেদ, টগর আর বিলকিসের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সেটি স্পষ্ট করে দেন লেখক। মুসলমান সমাজের গোঁড়ামির পাশাপাশি হিন্দুত্বের অহঙ্কারের চিত্রও লেখক এঁকেছেন। রামানন্দ পণ্ডিত ফটিকের বসা চেয়ারে গঙ্গাজল ছিটিয়ে তবেই বসেন এবং বলেন–'তুমি হচ্ছ যবন আর ধনা হচ্ছে চাঁড়াল। তুমরা দুটোই অস্পৃশ্য। তুমরা যতক্ষণ ঘরে ততক্ষণ জলস্পর্শ করি কী করে? গায়ে বামুনের রক্ত আছে যে, ধম্মটা বজায় রাখতি হবে তো?' আবার এই একই মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ফটিককে তোষামোদ করে অন্য ভাষায় কথা বলতেও পিছপা হন না। মনুষ্য-চরিত্র যে কী সাংঘাতিক, ধর্ম ও সমাজ নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার, নীচতা যে কী সাংঘাতিক, সেসবই তিনি অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্যে যে রামানন্দ পণ্ডিত আর মৌলবীদের মতন মানুষ বারংবার হিন্দু-মুসলমানের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেসবেরও স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি নিপুণভাবে এঁকেছেন। জমিরুদ্দির মুখে লেখক বলেছেন–'হিন্দুদিগের সঙ্গে মুছলমানদিগের মিশ খাওয়া সম্ভব না। ক্যান? না তার পেরধান কারণ এই যে ইরা দুটো আলাদা জাত। হিন্দুরা পয়দা হইছে হিন্দুস্থানে, মুছলমানরা পয়দা হইছে আরবে। আমাদিগের মুছলমানদিগের আসল দেশ হলো আরব দেশ।' অর্থাৎ, লেখক যেমন ইসলামের ধর্ম, নীতির উৎস সন্ধান করেছেন, সেইরকমই ওই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ফাঁকফোকরও। আবার, উভয়ধর্মের সংস্কারকদের ভূমিকাও লক্ষ্যণীয়, হিন্দুধর্মের সংস্কারকদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও চেতনা জাগ্রত হওয়ার আখ্যান উঠে এসেছে তাঁর লেখনীতে।

শেষ উপন্যাস 'প্রতিবেশী'-র মূল চরিত্র অমিতা। সে ও শামিম ভালোবেসেছিল পরস্পরকে। দুটি শিক্ষিত মনের মানুষ তাদের বুদ্ধি ও আবেগ দিয়ে পরস্পরকে শরীরে ও মনে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির ছায়া পড়ল তাদের ব্যক্তি জীবনেও। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তারা। যেমন ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল হিন্দু ও মুসলিম সমাজ। অমিতার মারণরোগ ক্যান্সারকে লেখক এখানে প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করেছেন সারা ভারতের রাজনীতির সঙ্গে তুলনা করে। এই উপন্যাসের ভূমিকায় গৌরী আইয়ুব লিখেছেন–'একটি মাত্র চরিত্রের সাহায্যে তখনকার জটিল রাজনৈতিক চিত্রটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার দুঃসাধ্য দায়িত্ব নিজের ওপর আরোপ করেছিলেন লেখক। অমিতার স্মৃতিতে ভিড় করে আসা মানুষগুলো তো তখন ছায়াছবি। তারই প্রেক্ষিতে একটি সংরক্ত প্রেমের কাহিনিও বুনে গিয়েছেন গৌরকিশোর। শামীম আর অমিতার সেই প্রেম যখন পারিবারিক আর রাজনৈতিক ধাক্কায় বিপর্যস্ত সেই সময়ে ভুল বোঝাবুঝির অবসান করার আশায় অমিতাকে একদিন প্যারাগনে আসতে বলেছিল শামীম। কিন্তু দিনটা হলো ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬। সেদিন কলকাতায় ডিরেক্ট অ্যাকশান যে কী চেহারা নেবে তা ওরা কেউই বুঝতে পারেনি। অমিতা সেদিন প্যারাগনে পৌঁছতে পারেনি। শামীম কি পেরেছিল? কে জানে? এর পরে তো চির-বিচ্ছেদ। আরও ঠিক এক বছর পরে ভারত-পাকিস্তানের বিচ্ছেদ ঘটল। এটাও প্রতীকী কিন্তু যন্ত্রণাটা তো মিথ্যা নয়।'

রাজনৈতিক ঘটনার পাশাপাশি ব্যক্তিবর্গের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তদানীন্তন ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রেও যেমন শ্রেণি-সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল, সেরকমই ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদও বিস্তার লাভ করেছিল, বিশেষত নারী-পুরুষে। কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে নারীদের জীবন আটকে রাখা, পুঁথিগত বিদ্যা থেকে নারীকে দূরে সরিয়ে রাখা এসবই ভয়ানক আকারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে একাংশ নারীদের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করার পক্ষে ছিল, অন্যেরা বিরোধীপক্ষ। 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে সেরকমই দুই চরিত্র ছিল শামীম এবং অমিতার বাবা, একজন প্রগতিশীল এবং অন্যজন জাত-পাতের বেড়াজালে আবদ্ধ। হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশী হয়েও তারা যে প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে পারেনি, অমিতা আর শামীমের সম্পর্কের ভাঙনের মধ্যে দিয়ে সেসব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ যখন শহর থেকে গ্রামে গিয়ে পড়েছিল এবং আন্দোলনের আঁচ লেগেছিল গ্রামের মানুষদের মধ্যে, সেই সময়কে এবং সম্পর্কের অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রেম, সংঘাত, রাজনৈতিক চেতনাকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন গৌরকিশোর তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। বিদগ্ধ পাঠকদের মধ্যে সাড়া-জাগানো এই ত্রয়ী উপন্যাস কালের সীমা অতিক্রম করে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আজও মূল্যবান।

২.

'এই যে একুশ শতক মহাশয়, নমস্কার, আপনার একটু সময় নষ্ট করতে পারি কী', অথবা 'মিসেস থ্যাচার ইন্দিরার পদবীটা লিজ নিতে পারেন' অথবা 'আমার ভালো নাম ফ্রাঁসোয়া অগুস্ত্ রেনে রদ্যাঁ, একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন নান্...'–আনন্দবাজারে তাঁর সাপ্তাহিক কলাম 'গৌড়ানন্দ কবি ভনে' পড়ে পাঠকের গুণমুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না, ১৯৮৯ তে লেখাগুলি গ্রন্থাকারে এসেছিল, বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত, 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং রাজনারায়ণী স্টাইল', 'ষষ্ঠ জ্যোতি বসু বনাম প্রথম জ্যোতি বসু', 'রাজভবনের লাল্টু আলু', 'ম্যাডামের নিরাপদ কেন্দ্র' ইত্যাদি। 'গৌড়ানন্দ কবি ভনে' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'বাঙালি বহুদিন যাবৎ মজা করিতে এবং মজা পাইতে ভুলিয়া গিয়াছে। গৌড়ানন্দ কবি বাঙালি পাঠক পাঠিকাকে মজার বাজারে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রয়াস সফল হইলে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইবে।' বলা বাহুল্য তাঁর প্রয়াস সফল হয়েছিল। হাফ পাঞ্জাবি, ধুতি, ভারী ফ্রেমের চশমা আর অবিন্যস্ত গোঁফে তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে যতই গুরুগম্ভীর মনে হোক, বাঙালি পাঠক তাঁর রসবোধ আস্বাদন করতে পেরেছিলেন। নবনীতা দেবসেন বলেছিলেন–'বাংলা সাহিত্যে রসসৃষ্টির নামে ইদানীং প্রচুর ছ্যাবলামির আমদানি হয়েছে, রুচিহীন বাচালতা,

অতিরঞ্জিত বাক্য বিন্যাসের ছড়াছড়ি। যেকোনো শব্দকেই জাতে তোলা যায়, যথাযথ প্রয়োগ করতে জানা চাই। গৌরকিশোর ঘোষের কলমে এই সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যের অমূল্য ক্ষমতাটি ছিল বলেই তিনি বারবার বিভিন্ন ছদ্মনামে, স্বনামে, বেনামে বিচিত্র ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন–তাঁর সমাজ সচেতনতা তাঁর চাবুকের মতো সমালোচনা সবই কত সহজে সাহিত্য রসে জারিত হয়ে বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।'

অন্তর্ভেদী দৃষ্টির জন্যে গৌরকিশোর ঘোষের লেখনী একটি অন্য মাত্রা পেয়েছে। তাঁর একের পর এক রচনা বিদগ্ধ পাঠকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছিল। গৌরকিশোর ঘোষের গল্প-সমগ্রের ভূমিকায় গৌতম ভদ্র লিখেছিলেন 'লেখকের তীব্র পর্যবেক্ষণ শক্তি, কৌতুকবোধ সরস সজীব ভাষা তাঁর চোখে দেখা রূঢ় কঠোর বাস্তবকেও উপভোগ্য করে তুলেছিল।' শুধু বাস্তবতার তীক্ষ্ণ হুল নয়, মজার কথা আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখতেও তাঁর জুরি কেউ ছিল না। রসবোধ থেকে লেখা 'ব্রজদার গুল্পসমগ্র' গৌরকিশোরের এক অনবদ্য সৃষ্টি, 'রূপদর্শী' ছদ্মনামে ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। পরে সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আরও পরে সিনেমা তৈরি হয় 'ব্রজবুলি' নামে। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সাগিনা মাহাতো, রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য। গৌরকিশোর তাঁর 'রূপদর্শী' নামের ইতিহাস হিসেবে বলেছেন, সাগরময় ঘোষ ফরমায়েস দিলেন লেখার, পরামর্শ দিলেন বিষয়ের, জীবনের কিছু তাজা ছবি এনে দিতে বললেন, নাম দিলেন 'রূপদর্শী'। প্রকাশ হতে থাকল কখনো নকশা, কখনো সংবাদভাষ্য। 'রূপদর্শীর নকশা', 'রূপদর্শীর সার্কাস' নামে তাঁর বিভিন্ন ধরনের লেখা, তাঁর পরিশীলিত চিন্তার ক্রমাগত প্রকাশ। লেখকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা এবং সেই দেখার প্রকাশই ছিল রূপদর্শীর মূল উদ্দেশ্য। তাঁর সমাজ-সচেতনতা, শাণিত কলম, এবং অন্তর্দৃষ্টিই রূপদর্শীকে জনপ্রিয় করেছিল। গৌতম ভদ্র লিখেছেন–'রূপদর্শী তো প্রধানত ভাষ্যকার, প্রদর্শক। সংবাদ সংকলন ঠিক তাঁর কাজ নয়। পরিবেশিত তথ্যে ধরা পড়া আপাতসত্যকে ফর্দাফাই করে দৈনন্দিন ঘটনাগুলো কোনো কোনো মৌলিক রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাঠামোয় বিধৃত, সেটাকেই রূপদর্শী বার করে আনেন। এই ভাবেই তাৎক্ষণিক খণ্ড খণ্ড ঘটনার সম্পর্ক বোঝা যায়, দৈনন্দিন আর তুচ্ছ থাকে না। নানা অসম খণ্ড কী করে পারস্পরিকতায় সংলগ্ন থাকে, তা ধরা যায়। রং বা মাটি ধুয়ে যায় কিন্তু পুরনো কাঠামোকে তুলে আবার নতুন প্রলেপে মূর্তি গড়া হয়। নানা রকমারি সংবাদের রকমফেরের মধ্যে সেই কাঠামোকে চেনানোই তাঁর ভাষ্যের কাজ।'

৩.

গৌরকিশোর ঘোষকে জীবিকার কারণে বহু বিচিত্র পেশা গ্রহণ করতে হয়েছে, ইলেকিট্রিশিয়ান থেকে আরম্ভ করে রেস্টুরেন্টের বয় অবধি। গৃহশিক্ষকতা ইত্যাদিও করেছেন। আবার ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক থেকে ইন্সিয়রেন্স কোম্পানির এজেন্ট, আবার কখনো কম্যুনিস্ট পার্টির ছাত্র শাখার কর্মী হিসেবে ফুড কমিটি, রিলিফ কমিটিতে কাজ করেছেন, লঙ্গরখানাও চালিয়েছেন। অলোক রায়ের মতে গৌরকিশোরের এইসব অভিজ্ঞতার প্রতিফলনই তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে।

গৌরকিশোরের গল্প-উপন্যাসে যেভাবে মুসলমান-সমাজের নিখুঁত বর্ণনা উঠে এসেছে, তার প্রধান কারণ তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। শুধু ধর্ম নয়, যেকোনো স্তরের মানুষের অধিকারের জন্য সর্বদা সোচ্চার হয়েছেন। রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিবাদ করতেও পিছপা হননি কখনো। প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠিও দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে পুত্রের উদ্দেশে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন–'আমি ষড়যন্ত্রকারী নই, রাজনীতির দলবাজি করি না, আমি মাত্রই এক লেখক। এবং দায়িত্বশীল। এবং সমাজসচেতন। এবং যুক্তিবাদী। নিজেকে সৎ রাখবারও চেষ্টা করি। তাই যখন বুঝলাম, প্রধানমন্ত্রী চোরাবালিতে পা ঠেকিয়েছেন, তখন সেটা প্রকাশ্যে জানিয়ে দেওয়াটাই আমার কর্তব্য বলে জ্ঞান করলাম। আমার বিন্দুমাত্র অহমিকা নেই, তাই আমি জানি আমার কথাতে প্রধানমন্ত্রী কানও দেবেন না। কিন্তু তাতে কি? আমি তো সর্বনাশ দেখতে পেয়েছি। আর তাই আমাকে তা বলতেও হবে।'

তবে লেখক গৌরকিশোরকে ছাপিয়ে সাংবাদিক গৌরকিশোর যে এগিয়ে ছিলেন তার প্রমাণ আমরা তাঁর বিভিন্ন রচনায় পেয়েছি। সাংবাদিকতায় নতুন মোড় এনেছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। মুক্তচিন্তা ও গণতান্ত্রিক চেতনার জন্যে জনপ্রিয় নির্ভীক গৌরকিশোরকে ১৯৭৫ সালের 'মিসা' (MISA) অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। জ্যোতির্ময় ঘোষের সম্পাদনায় 'কলকাতা' পত্রিকা এক 'বিশেষ রাজনৈতিক সংখ্যা' প্রকাশের ব্যবস্থা করল। সেখানে কিশোর ছেলেকে লেখা পিতা গৌরকিশোরের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে জরুরি অবস্থার অন্ধকারের কথা উল্লিখিত ছিল, বাক্‌স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছিল। পুত্রকে লিখেছিলেন, 'আমি মনে করি আমার লেখার অধিকার, আমার মত প্রকাশের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার অর্থ আমার অস্তিত্বকে হত্যা করা। এই কারণে আমি বর্তমান সেন্সর ব্যবস্থাকে মানবিক ন্যায়-নীতিবিরোধী, গনতন্ত্রবিরোধী এবং স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করি।' গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়েছে বলে মাথা কামিয়ে অশৌচ পালনও করেছিলেন তিনি। সাংবাদিকদের অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহু নির্যাতন সহ্য করেও নিরন্তর সংগ্রামের ব্রতী ছিলেন। একবছর বন্দি ছিলেন, কিন্তু তাঁর বন্দিত্ব তাঁর লেখনীকে থামাতে পারেনি। কারাগারে বসেই তিনি লেখেন 'প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি' এবং 'দাসত্ব নয়, স্বাধীনতা'। এইসব প্রবন্ধের মাধ্যমে সামাজিক অভিঘাতের উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি কারাগারে থাকাকালীন বিভিন্ন কবিতা, মতামত, পত্রালাপের মাধ্যমেও তদানীন্তন সময়ের মূল্যায়ন উঠে এসেছে। তাঁর পুরস্কারের ঝুলিও নেহাৎ কম ছিল না। সাংবাদিকতার জন্যে তিনি ১৯৭৬ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার 'কো জয় উক' স্মৃতি পুরস্কার এবং ১৯৮১ সালে ম্যাগসাসে পুরস্কারে সম্মানিত হন। একই বছর মহারাষ্ট্র সরকারের পুরস্কার, ১৯৯৩ সালে হরদয়াল হারমোনি পুরস্কার, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পুরস্কার পান। তিনি ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে আনন্দ পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং ১৯৮২ তে বঙ্কিম পুরস্কার পান তাঁর ট্রিলজি উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড 'প্রেম নেই' উপন্যাসটির জন্য।

গৌরকিশোরকে একসময় সিআইএ-র এজেন্ট বলেও রটানো হয়েছিল। আমেরিকা থেকে কয়েকজন তাঁর বাড়িতে এসে কনসার্ট করার পর সেই প্রচার আরও জোরদার হয়। বিষয়টি এতদূর গড়ায় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তিনজন ছাত্র-প্রতিনিধি তাঁর চুনিবাবুর বাজারের ফ্ল্যাটে সরেজমিন তদন্তে গিয়েছিলেন। তাঁরা শুনেছিলেন, অতি বিলাসবহুল জীবনযাপন তাঁর। দামি আসবাব, আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া বাতানুকূল ফ্ল্যাট। গিয়ে দেখেন ছোট্ট ঘরে তক্তাপোষের জীবনযাপন। ১৯৭০-এ নকশাল আন্দোলন চলাকালীন নকশালদের কোপের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। আদর্শের দোহাই দিয়ে খুনের রাজনীতির বিপক্ষে তীক্ষ্ণ আক্রমণ ছিল তাঁর লেখায়। তাঁর মুণ্ডু চাই বলে নকশালরা ডাক দিয়েছিল। কিন্তু গৌরকিশোর ভীত হয়ে লেখা থামাননি। বরঞ্চ যখন তিনি মনে করেছেন, তখন তিনিই আবার নকশালদের বিরুদ্ধে পুলিশের নির্বিচার দমন নীতির প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন। 'রূপদর্শী'র কলমে বারবার লিখেছিলেন, পুলিশ যেভাবে নকশাল-নিধন চালাচ্ছে তা অমানবিক। আসলে শুধু রাজনৈতিক বিশ্বাস নয়, ধর্ম, সম্প্রদায়, আচার, নিয়ম সর্বক্ষেত্রেই গৌরকিশোর মুক্তচিন্তক, মানবতাবাদী, সংস্কাররহিত, উদারপন্থী ছিলেন। ১৯৯২ সালে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর উত্তেজনার আঁচ পৌঁছেছিল কলকাতার কিছু কিছু এলাকায়। শুনেছি তখন গৌরকিশোর ঘোষ বিভিন্ন সংবেদনশীল পাড়ায় ঘুরে বাসিন্দাদের অবস্থা দেখে তা লিখতেন এবং মানুষদের সম্প্রীতি রক্ষার গুরুত্ব বোঝাতেন।

প্রচলিত রীতি-নিয়মকে অস্বীকার করতে পিছপা হতেন না গৌরকিশোর। তাঁর বিবাহ নিয়েও অনেক কথা শুনেছি। তাঁর বিবাহের অনুষ্ঠানে প্রবেশমূল্য করেছিলেন পাঁচ টাকা! টিকিট না কেটে ঢোকা যাবে না। তাঁর বাবাকেও টিকিট কাটতে হয়েছিল। আমন্ত্রিত রাজশেখর বসু গৌরকিশোরকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, 'তোমার বিয়ে নিয়ে আগ্রহ নেই। আমার আগ্রহ সেই মেয়েটিকে নিয়ে, যে তোমাকে পছন্দ করল।' এককথায় অসামান্য প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। প্রথিতযশা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক গৌরকিশোরের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা। •

ঈশিতা ভাদুড়ী ॥ কবি ও প্রাবন্ধিক

অন্য গ্রীষ্ম

ই সন্তোষ কুমার

অনুবাদ : তৃষ্ণা বসাক

মালয়ালম ছোটগল্প

পূর্ব প্রকাশের পর...

'বায়োপ্সি? তাহলে... 'রঘু দ্বিধা করল 'কখন বায়োপ্সি করে?'

'এটা যেকোনো সময়ে করা যায়' ডক্টর বললেন। 'কিন্তু ব্লিডিংটা কমাতে হবে। নইলে রেজাল্ট ঠিক আসবে না। তারপর আমি প্রেস্ক্রিপশন লিখব। রেজাল্ট আসতে এক সপ্তাহ লাগবে।'

সে উঠতে যাবে, ডক্টর বললেন 'এখুনি আপনার স্ত্রীকে এসব কিছু বলার দরকার নেই। এটা খুবই সম্ভব যে টেস্টের পর চিন্তার কিছুই থাকবে না। একটা ছোট অপারেশন করেই গ্রোথটা বাদ দিয়ে দেওয়া যাবে।'

রঘু মেনে নিল ওঁর কথা। 'হয়তো তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। বোধহয় একটু ফোলা আছে। কমে যাবে' সে সুনন্দাকে এমনভাবে বলল যেন তেমন কিছুই ঘটেনি।

'হতেই পারে না' সুনন্দা মানতে চাইল না। 'ঐ বাচ্চা ডক্টর ভালো করে রোগ ধরতে পারেনি'

‘এত নিখুঁত করে ধরার আছেটাই বা কী?’ রঘু রেগে গেল। তারপর সে একটু থেমে বলল ‘আরেকটা টেস্ট করে দেখা যাক।’

‘আমি যাব না। একই জায়গায় আমি আর যাব না। লোকে দেখে।’

‘দেখুক গে। তুমিই তো বলতে লোকের কথা তোমার গা সওয়া হয়ে গেছে।’

‘সেটা নয়। আমি এখন কারো সামনে দাঁড়াতে চাই না। সবাই ভাববে আমরা এখনও বাচ্চার পেছনে দৌড়চ্ছি।

‘লোকের ভাবনায় আমাদের কীই বা যায় আসে? এটা শুধু তোমার আমার ব্যাপার।’

তবু সুনন্দা রাজি হলো না। ‘আমরা অন্য কোথাও যাব। এমন কোনো জায়গা যেখানে আমাদের কেউ চেনে না, কেউ খেয়াল করবে না। এমন কোনো জায়গায় আমি অনেক সহজ হতে পারব। অচেনা লোকের ভিড়ের থেকে ভালো আড়াল আর কিছু নেই।’

শেষ পর্যন্ত অনেক তর্কবিতর্ক আর খোঁজাখুঁজির পর ওরা বি শহরে এল।

ভিড়ের মধ্যে একলা দাঁড়ানো, নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থাকা শিরিশ গাছের শহরে।

বি শহরে তাদের প্রথম দিনে সুনন্দা সারাদিন বিছানায় শুয়েই কাটাল। সন্ধের দিকে তার শরীর একটু ভালো হলো। রাতে তার ভালো ঘুম হলো।

পরদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে তারা ডাক্তারের কাছে গেল। টেস্ট করা হলো। ফেরার পর সুনন্দা বলল ‘তুমি কি বোর হচ্ছ?’

সে কোনো উত্তর দিলো না। সে বিছানায় বসে একটা বই পড়ার চেষ্টা করছিল।কিন্তু মন বসাতে পারছিল না।

‘কেন তুমি আমাকে একটা ভূতের মতো পাহারা দিয়ে বসে আছ?’ সে বলল, তার ঠোঁটে হাসি খেলে যায়। ‘বেড়িয়ে এসো। এখন এখানে অনেক কিছু দেখার আছে। আমরা তো আস্তে আস্তে দেখলাম কত বদলে গেছে সব। তুমি হেঁটেই সময় কাটাতে পারবে।’

‘তোমার একা লাগবে না?’ রঘু জিগ্যেস করে।

‘সেটা কোনো ব্যাপার না। আমার বেরোতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু তুমি যাও। কতক্ষণ এখানে বসে থাকবে? আর এখন সবরকম সুবিধে মজুত। কিছু লাগলে তোমাকে মোবাইলে ফোন করে নেব।’

‘সেটা সত্যি। আগের মতো নেই আর। সেল ফোন আছে বলে যেকোন সময়ে ফেরা যায়।’

ঘর থেকে বেরোবার আগে সে জিগ্যেস করল ‘আমরা কি পুট্টাপারথি বা তিরুপতি কোথাও যাব?’

সুনন্দা হাসল ‘কবে থেকে আবার তুমি ভক্ত হয়ে উঠলে?

‘সে জন্যে না। আমরা কি ওইসব জায়গা যাবার অজুহাতে হোম টাউন ছেড়ে আসিনি? রেজাল্ট আসতে চার পাঁচদিন লাগবে। আমরা চাইলে যেতে পারি, ব্যস এটাই।’

‘না’ সুনন্দা অনড়। ‘যখন দরকার ছিল, ভক্তি আমাদের কাজে আসেনি। আমি কোনো আশ্রমে গিয়ে ভজন গাইতে পারব না।’

রঘু উত্তর দিলো না।

‘কিন্তু তুমি চাইলে তুমি যেতে পারো। ঠিক আছে?’ একটু থেমে বলে সুনন্দা। ‘একা থাকতে আমার ভয় লাগবে না।’

‘না, আমি একা যাবার কথা বলিনি।’

‘তাহলে এই শহরটাই ঘুরে এসো না কেন? সব বদলে গেছে। তোমার মনেই হবে না তুমি আগে এসেছিলে।’

রঘু বেরোতে যাবে, সেইসময় সুনন্দা তাকে খুঁটিয়ে দেখে বলল ‘তুমি এখন আমাকে ঘেন্না করো, তাই না?’

রঘু ওর দিকে তাকাল। সুনন্দার চোখদুটো দুঃখী। সে কোনো কথা বলল না।

‘আমি চুরমার হয়ে গেছি। আমার শরীর শেষ হয়ে গেছে। এ আর কী কাজে লাগবে?’

সেও এটা জানত। কত সপ্তাহ হয়ে গেছে সে এমনকি ওকে ছোঁয়নি পর্যন্ত। কত রাত তাকে তাড়া করে ফিরেছে তার শরীরের অসহায় বিলাপ। সেইসব মুহূর্তে সে অনুভব করেছে দুজনের মধ্যের ঘৃণা।

‘যদি আমি মরে যাই’ সে নিজের অভিব্যক্তি না বদলে জিগ্যেস করে ‘আমি যদি মরে যাই, তুমি কি আবার বিয়ে করবে?’

‘তুমি মরবে না’ সে জোর দিয়ে বলে ‘অন্তত আমার আগে না।’

‘তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না’ সে হাসল

সে অস্থির হয়ে বলে ‘তুমি কী শুনতে চাইছ?’

‘তোমার বিয়ে করা উচিত। এটাই আমার ইচ্ছে। সেই বিয়েতে বাচ্চা হবে।’ সে মাপা গলায় বলল ‘পুরনো সিনেমার সেইসব ট্র্যাজিক হিরোদের মতো না, লম্বা চুল, উসকোখুসকো দাড়ি, কখনো না।’

‘আসার সময় কিছু আনব তোমার জন্যে?’ বিষয়টা বদলানোর জন্যে বলে সে।

‘না আমার কিছু লাগবে না। একটা সিনেমা দেখে এসো’ তারপর সে একটা রহস্যময় হাসি হাসল। ‘তরুণ তরুণীদের দেখো। ওইসব বিজ্ঞাপন দেখো মনের সুখে।’

বাসে চড়ে সিটি সেন্টারে যেতে যেতে রঘু ভাবছিল সুনন্দা কী বলেছিল। হয়তো তার উদ্বেগ তার একঘেয়েমি নিয়ে নয়। আজকাল একান্তে থাকা তার প্রথম পছন্দ। একলা থাকা, নিজের গভীরে ডুবে থাকা।অন্য যা কিছু, অন্য কোনো লোক তার একাকিত্বকে ভেঙে দ্যায়। সন্ধেয় একটু বাড়ি ফিরতে দেরি হলেও তার সেই অভিমান, অবুঝপনা এখন আবছা হয়ে এসেছে। নিজের শরীর, যা একটা অবাধ্য কিশোরীর মতো এখন, তাকে দেখতে গিয়ে বাকি সব কিছুই তার কাছে সুদূরের হয়ে গেছে। তার ছোট্ট জগত ঘিরে আছে এমন সব এলিয়েনের বিশাল জগৎ।

রঘু রাস্তার আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো দেখতে দেখতে বি শহরে এলোমেলো ঘুরে বেড়াল। তারপর সে দূর থেকে মেট্রো ট্রেন দেখতে পেল। সে সেই দিকে ঘুরে গেল। সিঁড়ি দিয়ে পাতালে নেমে সে তিন নম্বর স্টেশনের টিকেট কাটল। তখন পিক আওয়ার ছিল না, বেশিরভাগ সিটই খালি ছিল। তিন নম্বর স্টেশনে নেমে সে সিঁড়ি দিয়ে মাটির ওপরে উঠে এল। এটা মনে হলো বি শহরের প্রাণকেন্দ্র। রাস্তার দুধারে উপচে পড়া ভিড়। চারদিকে গাড়ি ছুটছে, ট্রাফিক সিগন্যলে একটু শুধু বিরতি।মাথার ওপর মেঘহীন গনগনে আকাশ, গরম একটা দিন।

সে দেখল একদল মেয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে। সবাই গায়ে সেঁটে বসা জিনস আর টি শার্ট পরা। টি শার্টের ওপর স্লোগান লেখা। দূর থেকে পড়া যাচ্ছে না। হাতে বই, কাঁধে ব্যাগ, মনে হয় কলেজ পড়ুয়া। কিংবা কোচিং ক্লাস থেকে ফিরছে, বা কল সেন্টারে চাকরি করে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সে ওদের দেখছিল। সিগনালের লাল সংখ্যাগুলো কমছিল।

মেয়েগুলো তার দিকের ফুটপাথে চলে এসে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। সে অমনি কলের পুতুলের মতো ঘুরে গেল। ভিড়ের জন্যে তারা আস্তে হাঁটছিল। তাদের নাচের ছন্দের মতো পদক্ষেপ তার চোখ টানছিল। যতক্ষণ না তারা দূরে হারিয়ে গেল ততক্ষণ রঘু তাদের দেখতেই থাকল। খানিকটা উঁচু থেকে বিলবোর্ডের চোখ ধাধানো সুন্দরী তাকে চোখ মারল।

সিগনাল সবুজ হয়ে গেছে। হর্নের কানফাটানো আওয়াজ তাকে বাস্তবের মাটিতে ফিরিয়ে আনল। সে কোনোদিকে যাবে বুঝতে পারছিল না...

‘হেলো, আপনি এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?’ এক তরুণী রঘুর কাঁধ ছুঁয়ে জিগ্যেস করল। রঘু ঘুরে তাকাল ‘এই শহরে এ কে আমার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলছে?’

চেনা কেউ বলে মনে হলো না। ‘এমন কি হতে পারে, কোথাও আগে দেখেছি, মনে করতে পারছি না? অথবা এমন কেউ যাকে দেখতে চেয়েছি?’

‘দৃষ্টি দিয়ে এই মেয়েগুলোর রক্ত শুষে নেবেন না, বেচারা মেয়েগুলো। ওদের আরও কিছুদিন বাঁচতে দিন’ মেয়েটা হেসে বলল।

‘ও নিশ্চয় লক্ষ করেছে আমি এখানে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মেয়েগুলোকে দেখছিলাম’, রঘু মনে মনে ভাবল। সে লজ্জায় পড়ল। সে মেয়েটার দিকে বোকার মতো তাকাল।

‘কোনো ব্যাপার নয়’ মেয়েটা চোখ মটকে বলল ‘মজা করছিলাম। আফটার অল, মজার ব্যাপার তাই না?’

‘আমাদের কি আগে দেখা হয়েছে?’

‘হয়েছে কি?’ মেয়েটা ওর দিকে দুষ্টুমিভরা চোখে তাকাল। ‘হয়তো... নাঃ মনে হয় না। কিন্তু আগে দেখা হয়েছে কিনা তাতে কিছু এসে যায় না। আমরা আলাপ করতেই পারি। যখন আমি দেখি কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে

মেয়ে গুনছে, আমি ভাবি একটু ব্যাপারটা দেখি তো। কোনো খারাপ কিছু আছে নাকি?'

সে অনুমান করল মেয়েটার বয়স ২৫র আশপাশে। বড় কালো গগলস। ঠোঁটে চকচক করছে লিপস্টিক। কাঁধ অব্দি ছাঁটা হেনা করা চুল। একটা টি শার্ট পরে আছে, যার নেকলাইন ক্লিভেজের গভীরে নেমে গেছে। টি শার্টে লেখা 'আই অ্যাম ডার্টি, মাই ডিয়ার' ফেডেড নীল জিনস, ডান হাঁটুর কাছে কাটা। 'এ কে?' রঘু বুঝতেই পারছিল না।

'আপনার হাতে সময় থাকলে একটু হাঁটা যাক' মেয়েটা বলল। চশমা খুলে, রুমাল দিয়ে মুছে মেয়েটা ওর দিকে তাকাল। অদ্ভুত ধরনের সৌন্দর্য। আগুনের শিখার মতো রূপ। ঐ ঝলমলে হাসিতে ভরা চোখদুটো নিঃশব্দে ডাক পাঠাচ্ছে।

সে উত্তর দিলো না, কিন্তু ওর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

'এখানে এই প্রথম?' মেয়েটা জিগ্যেস করল

'না।'

রঘু বিস্তারিত বলল না। প্রথম বার এসে যা দেখেছিল, সেই শহর এটা নয়। বাড়ি, রাস্তা, গাড়ি, বিলবোর্ড... সব কিছু বদলে গেছে। এমনকি লোকগুলোও।

'এইভাবে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ এসে তুলে নিয়ে যাবে' মেয়েটা হাসছিল 'কিংবা অন্তত পকেট মারবে।'

'আমি সিগনাল সবুজ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম...' রঘু বোঝাবার চেষ্টা করল।তারপর সে হাল ছেড়ে দিলো। আরেকদল মেয়ে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

'কেরালার কোথায় বাড়ি?' মেয়েটা জিগ্যেস করে। সে তার জায়গার নাম বলে।

'আমরা কি কোথাও কিছুক্ষণ বসতে পারি?' মেয়েটা প্রস্তাব দ্যায়। 'এত গরমে বেশি চলাফেরা না করাই ভাল।আমি সন্ধে অব্দি ফ্রি। যদি আপনার হাতে সময় থাকে...'

রঘু ওর দিকে তাকাল। সে টের পেল মেয়েটার মুখে এক ঝলক দুষ্টুমি খেলে গেল। সে গলায় ছোট স্টিলের চেন পরে আছে, তাতে নীল লকেট। লকেটের ছবিটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েটার ব্যবহার পুরনো বন্ধুর মতো, রঘুর মনে হলো। কিন্তু তবু ওর মনে সন্দেহ ছিল।

'কোথায় বসব?' ও ভাবল 'পার্কে বসা যায়' সে প্রস্তাব দিলো।

'কিন্তু কাছাকাছি এমন কোনো পার্ক নেই। তাছাড়া এই দুপুরে কে পার্কে যায়? ' সে ওর দিকে তাকিয়ে একটু থেমে বলল 'একটা পাবে যাওয়া যায় না?'

'পাব...'

'কী হলো স্যার? ভয় পেলেন? একটা বিয়ার আপনাকে ঠান্ডা করে দেবে। কেন, আপনি বিয়ার খান না?'

'কখনো সখনো। কিন্তু...'

'কোনো কিন্তু না। সোজা চলুন। আর কয়েক পা গেলেই মোড়ের মাথায় একটা পাব আছে। ওখানে কোনো ভিড় হবে না।'

পাবের ভেতরে ছোট ছোট কেবিন। পুরনো কিন্তু পরিচ্ছন্ন জায়গা। দেওয়ালে ড্রাগন দেখে রঘুর চাইনিজ রেস্তোরাঁর কথা মনে পড়ল, প্রথমবার এই শহরে এসে যেখানে সে আর সুনন্দা ডিনার করেছিল। নিবু নিবু আলো আর দ্রুত লয়ের পশ্চিমি গান। খুব বিচ্ছিরি রকম চড়া। তারা একটা ফাঁকা কেবিনে ঢুকে পাশাপাশি বসল। প্রথমে সে মেয়েটির উল্টোদিকে বসেছিল। কিন্তু মেয়েটি ওর পাশে হাত দেখিয়ে ওকে সেখানে বসতে বলল 'আমরা নিজেদের কথা শুনতে পাব যদি কাছাকাছি বসি। শুনছ তো অ্যাসিড রক বাজছে। এই ধরনের স্টিরিও সাউন্ড চললে আমার মাথা ফাঁকা হয়ে যায়'

'দু ক্যান বিয়ার' ওকে না জিগ্যেস করেই অর্ডার দিলো মেয়েটি। যখন বেয়ারা চলে গেল তখন ও রঘুর হাত হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে চাপড়াতে লাগল।

'তুমি চুপ করে বসে আছ কেন? রাস্তায় যে সাহস দেখাচ্ছিলে, কোথায় গেল?' বিয়ার ক্যান মুখের কাছে এনে সে বলল।

রঘু ক্যাবলার মতো হেসে ওর দিকে একঝলক তাকাল। বিয়ার একটু টেস্ট করে টেবিলে রেখে দিলো ক্যানটা।

'যেসব লোকেদের সঙ্গে আলাপ হয় তাদের আমি খুব সহজেই চিনতে পারি' বলল মেয়েটা। রঘু চুপ করে থাকল।

সে রঘুর টি শার্টে ফুঁ দিয়ে বলল 'এই এসি ঘরেও কী গরম তাই না?' রঘু ওর ক্লিভেজের ফাঁকে উঁকি দিলো একটু যদি বুক দেখা যায়।

'ওহ, তুমি কী দেখছ?' মেয়েটা দুষ্টু হেসে বলল। রঘু বুঝতে পারল না কী উত্তর দেবে।

'এই লেখাগুলো।' সাহস সঞ্চয় করে সে ওর বুকের দিকে তাকিয়ে বলল 'এগুলো এরকম কেন?'

'এগুলো নিয়ে কী সমস্যা হলো?'

'এই যে লেখা আমি নোংরা। মাই ডিয়ার।'

'কারণ আমি নোংরা' সে খুব ক্যাজুয়ালি বলল

'তাই কি?' তার অসহায় লাগছিল, উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাচ্ছিল না।

'সিলি গাই, টি শার্ট দোকান থেকে কেনা। এই কথাগুলো কি আমি লিখেছি? বিয়ার খাও। বিয়ার না খাওয়ার সব লক্ষণ ফুটে উঠছে।'

সে এক চুমুকে পুরোটা খেয়ে নিল। সে দুজনের জন্যে আরও একটা করে অর্ডার দিলো। তারপর খুব নরম করে ওর হাত ধরল।

দু ক্যান বিয়ার খাওয়ার পর রঘু সাহসী হয়ে উঠল। সে মেয়েটার জিনসের ওপর দিয়ে আঙুল চালিয়ে ওর উরুতে চাপ দিলো। মেয়েটা মেনু কার্ড দেখছিল। সে ভান করছিল যেন এসব কিছুই খেয়াল করছে না। ওর মসৃণ শরীর রঘুর নেশা ধরাচ্ছিল। সে খুব জোরে ওর উরু খামচে ধরল।

'এই করছটা কী?' সে ওর হাত ছাড়িয়ে আনল আর বকুনির ভঙ্গিতে বলল 'চামড়া উঠে আসবে যে।'

উরু থেকে হাত সরিয়ে সে ওর কাঁধে আর ঘাড়ে নরম করে ছুঁল।

'এই তো, ভালো ছেলে' সে বলল 'আমরা কী খাবার অর্ডার দেব?'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

'কেন তোমার কিছু পছন্দ নেই?'

'আমার তোমাকে পছন্দ' ওর গলায় ব্রীড়া ফুটে ওঠে। 'আমি আমার বিয়ারসের সঙ্গে একটা নোংরা মেয়েকে খেতে চাই।'

'স্মার্ট, টপ গিয়ারে উঠছ!' আচমকা সে ওর গালে চুমু খায়।

'আমি যখনি এখানে আসি, আমি একটা স্পেশাল ডিশ নিই।'

'সেটা কী?'

'ড্রাগন চিকেন' সে দেওয়ালের ড্রাগনের দিকে আঙুল দেখায়। 'দেখো, ড্রাগন একটা স্মার্ট গাই। এটা হট হবে। বিয়ার সেটা সামলে নেবে'

'তোমার পছন্দ ড্রাগন হলে ড্রাগনই হোক' নেশা ধরার মুখে রঘু বলল। 'আমারও হট ভালো লাগে'। সে মেয়েটার টি-শার্টের ওপর হাত রাখল।

'ওহ! মাই ডিয়ার মাস্টার, একটা সত্যি কথা বলি তোমাকে, মেয়েদের সঙ্গে কেমন করে চলতে হয় তুমি জানো না। কী লম্পট তুমি!'

'ওকে। তাহলে তুমি বলো মেয়েদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়' রঘু ওর বুকের ওপর থেকে হাত সরাল না।

'মানে হচ্ছে' মেনুকার্ড বন্ধ করে ও বলল 'মেয়েরা হচ্ছে কাচের নৌকোর মতো। এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে না। তাহলে ভেঙে যাবে। শুধু খুব খুব নরম করে চড়তে হবে।'

যেন ব্যাপারটা দেখানোর জন্যেই সে তার হাত রঘুর শার্টের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো, ওর লম্বা লম্বা আঙুলগুলো রঘুর বুকের ওপর খেলে বেড়াচ্ছিল। উত্তেজনায় রঘু কেঁপে উঠল।

'আরে, আমি জিগেস করতেই ভুলে গেছি, তোমার সঙ্গে টাকা আছে তো?' সে হাত সরিয়ে নিয়ে রঘুর দিকে তাকাল।

'এমন প্রশ্ন করছ কেন?'

'ভুল বুঝো না। আসার পথে এটিএম থেকে তুলব ভেবেছিলাম। কিন্তু এখানে ঢুকে পড়লাম। এই পাবটা খুব এক্সপেন্সিভ। মোটা বিল আসবে।'

'ওহ বিল... এই নিয়ে ভাবছ? বেশি হলে ২০০০?' রঘু পকেট থেকে পার্স বার করল।

'দেখো ক্যাশ ৩০০০ টাকা আছে। আর একটা এটিএম কার্ড। দরকার হলে এটা ব্যবহার করা যাবে। যথেষ্ট?' • *চলবে...*

তৃষ্ণা বসাক ॥ কবি ও অনুবাদক

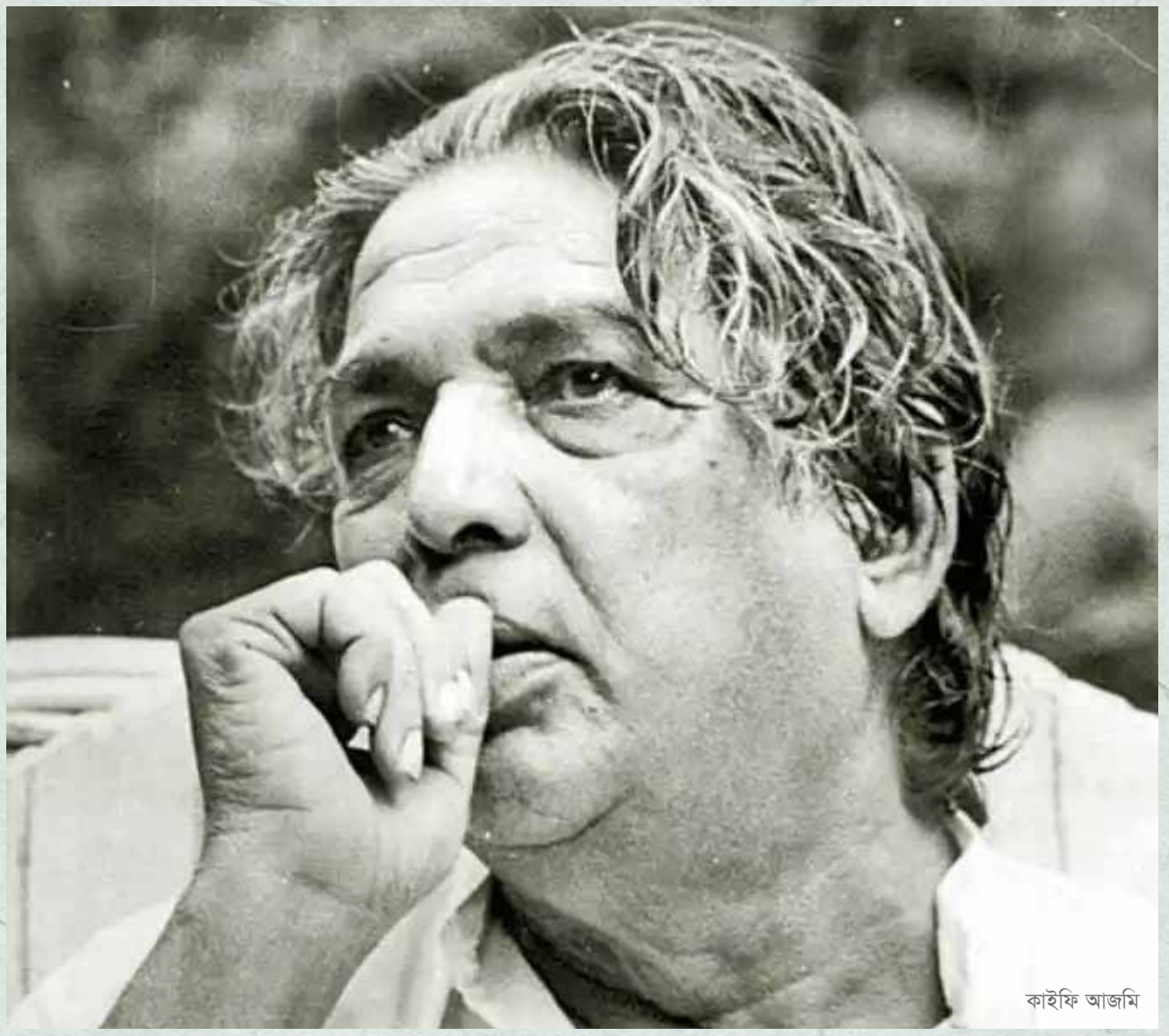

কাইফি আজমি

অনূদিত কবিতা

কাইফি আজমির দুটি কবিতা

মূল উর্দু থেকে অনুবাদ : সফিকুন্নবী সামাদী

[কাইফি আজমি (১৯১৯-২০০২) : পিতৃপ্রদত্ত নাম আখতার হুসেন রিজভী। ভারতের প্রগতিশীল উর্দু কবি। প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও। জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন যেমন প্রগতিশীল কবিতা রচনা করে তেমনি হিন্দি চলচ্চিত্রের গীত, কাহিনি, সংলাপ রচনা করে। আকাদেমি পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (চলচ্চিত্র : সাত হিন্দুস্তানি), ফিল্মফেয়ার পুরস্কার (চলচ্চিত্র : গরম হাওয়া), সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। 'ঝঙ্কার', 'আখির-এ-শব', 'আওয়ারা সিজদে' 'ইব্লিস কী মজলিস-এ-শূরা' তাঁর কাব্যগ্রন্থ]

বাংলাদেশ

[১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত]

আমি কোনো দেশ নই যে জ্বালিয়ে দেবে আমায়
কোনো দেয়াল নই যে গুঁড়িয়ে দেবে আমায়
কোনো সীমান্তও নই যে মুছে ফেলবে আমায়
এই যে পৃথিবীর পুরনো মানচিত্র
টেবিলের ওপর বিছিয়ে রেখেছ তুমি
এর মাঝে নিরর্থক রেখাগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই
তুমি আমাকে এর মাঝে কোথায় খুঁজে ফেরো
আমি এক দেওয়ানার আকাঙ্ক্ষা
অফুরন্ত প্রাণশক্তিপূর্ণ স্বপ্ন কুঁচলে দেওয়া মানুষের
লুটতরাজ যখন সীমার বাইরে চলে যায়
জুলুম যখন অতিক্রম করে সীমা
হঠাৎ কোনো এক কোণে আমি দৃশ্যমান হই
কোনো বক্ষ থেকে উঠে আসি
এর আগেও তুমি আমাকে দেখেছ নিশ্চয়
কখনো পূর্বে কখনো পশ্চিমে
কখনো শহরে কখনো গ্রামে
কখনো মানুষের বসতিতে কখনো জঙ্গলে
আমার কেবলই ইতিহাস আর ইতিহাস, ভূগোল নেই কোনো
ইতিহাসও এমন যা যায় না পড়ানো
মানুষেরা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে
কখনো প্রভু হয়েছি কখনো স্বীকার করেছি প্রভুত্ব
হন্তারকদের কখনো আমি চড়িয়েছি শূলে
আর কখনো আমাকে চড়ানো হয়েছে শূলে
তফাৎ এইটুকুন যে, আমার হন্তারক নিহত হয়ে যায়
আমি না মরি না মরতে পারি
কতোটা নির্বোধ তুমি
তুমি খয়রাতে পেয়েছ যে ট্যাংক
তাদের নিয়ে আমার সীনার ওপর উঠে বসো
রাত-দিন করো নাপাম বোমার বর্ষণ
দেখো, তুমি ক্লান্ত হয়ে যাবে
কোন হাতে পরাবে শেকল বলো
আমার তো সাড়ে সাত কোটি হাত
কোন মাথা আমার গর্দান থেকে করবে আলাদা
আমার গর্দানে রয়েছে সাড়ে সাত কোটি মাথা

আমার অতীত আমার কাঁধে

এবিষয় মানবের সংস্কৃতির বিজয় নাকি হার
আমার অতীত আমার কাঁধে এখনো সওয়ার
আজও দৌড়ে গিয়ে করি যখন আলিঙ্গন
জেগে ওঠে আমার বুকের ভেতর কোনো জঙ্গল
শিং যেন গজিয়ে ওঠে আমার মাথায়

পড়ে চলেছে আমার অতীতের ছায়া আমার ওপরে
রক্তপাতে ভরা কাটিয়ে আসা যুগ লুকাবো কী করে
সকল দাঁত আমার মনে হয় রক্তে ডোবানো

যার সাথে না রয়েছে প্রেম না বৈরীতা আমার
তাকে করে বসি আমি আক্রমণ
তাকেই বানাই আমি নিজের শিকার
আর পূর্ণ করি নিজের জীবন

উদর আর উদর আমার শরীরে, না হৃদয় না মস্তিষ্ক
কত অবতার এসেছেন দীপশিখা জ্বালিয়ে নিয়ে হাতে
তাকিয়ে দেখেছি, ধুতে পারিনি অতীতের এই দাগ
সভ্যতার রঙ কপালে নিয়েছি মেখে
কিন্তু বর্বরতার দাগ মলিন হয়নি এখনো
গ্রাম বসিয়েছি শহর বানিয়েছি আমি
জঙ্গলের সাথে যে সম্পর্ক আমার তা হয়নি ছিন্ন এখনো
যখন কোনো বাঁকে ওড়ে ধূলি
আর চোখে পড়ে তার মাঝে নিষ্পাপ কোনো শিকার
কি জানি কেন কাঁধে হয় উন্মাদনা সওয়ার

কোনো ঝোঁপের আঘাতে যা খসে পড়েছিল কখনো
সেই লেজ পুনরায় ওঠে গজিয়ে আমার পশ্চাতে
নিজের পায়ের ওপর দিয়ে ভর উল্লম্ফন করি যখন
তলিয়ে যাই ততটাই নিচে শতাব্দী ধরে উঠেছি যতটা

এবিষয় মানবের সংস্কৃতির বিজয় নাকি হার
আমার অতীত আমার কাঁধে এখনো সওয়ার

সফিকুন্নবী সামাদী ॥ অনুবাদক ও অধ্যাপক

রবীন্দ্র গোপ

লতাপাতার গল্পকথা

হিজল গাছটা ভ্রমণপিপাসু মানুষের প্রেম
কার স্মৃতির সানাই বাজে জোনাকির গানে
ছোট্ট কাঠের সাঁকোটি ভালোই তো ছিলো
এখন ইটের পোশাকে সেজেছে পাষাণ হৃদয়।

শত মানুষের দীর্ঘশ্বাস প্রেমের কবিতা ছন্দময় দিন
ওপারে আকাশ হাওয়া হাওয়া কাঁধে হাত দিয়ে
কত জনমের প্রেম, যদি আর দেখা না হয়
তবু হিজলের ভালোবাসা লতাপাতা গলায় হারের গান।

কান পাতলে শোনাবে স্মৃতির লোকজ গল্পকথা
নকশিকাঁথা লোক কারুশিল্পের পুঁতির রঙিন মালার কথা।

পাশা খন্দকার

অপেক্ষার প্রহর

আমি যদি জল প্রত্যাশা করি
তুমি তখন বাদলের মেঘবতী আকাশ হও, কেকার
নৃত্য করো নিপুণ মুদ্রায়;
কি অবুঝ নেশার ঘোরে
দ্রাক্ষারসের পানপাত্রে
তোমার প্রতিবিম্বে চাঁদ খেলা করে
ছায়ামিশ্রিত আলোর লুকোচুরিতে
হিমেল জলজ প্রাণীর মতো
ডুবে থাকো বরফ মৌনতায়;
আমার যত আদ্রতা
তোমার তৃষিত শরীর শুষে নেয়।
আমি স্পন্দনহীন অস্থিতে
রেখে যাই
আমার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও সমকাল।

মামুন মুস্তাফা

সুজাতার ভিটে

কৃচ্ছসাধনে অবসন্ন দেহ। সন্ধে নামে...
ধীরে ধীরে মুছে যায় সারাদিনের মুখরতা
তখন নিরঞ্জনা নদী শান্ত। এইমাত্র শেষ
স্নানে যুবতীগায়ের গন্ধ নিয়ে দাঁড়িয়ে।
সুজাতা ফিরে যায়। গভীর অবসাদ
দূর করে ওই সাধুসঙ্গ অন্ন।
এরপরই মোহমুক্তির নির্বাণ লাভ।
বোধিবৃক্ষদ্রুমে সুজাতার নিবিড় ছায়া ঘন হয়,
গাঢ় করে জীবনের সমস্ত সংসার।

বৌদ্ধিক জ্ঞান...অশোক স্তম্ভ...
ক্রমশ ছুঁয়ে যায় সুজাতার ভিটে।

আদিত্য নজরুল

ভ্রমণ

কেনো ফুলদানির সৌন্দর্যে এত মুগ্ধ

একবার শুধু
উপলব্ধি করো বাগানের ফুলগুলো
কেমন কোমল ভাবে
অলংকৃত করছে সুপ্রভাত।

শোকসভা
কিংবা কোনো আনন্দ মিছিলে
ফুলের কি থাকে না
অস্তগামীতার শোক!

ফুলেরও দুঃখ আছে
তাই হয়তো গোলাপ নিয়ে আসে
এক দুপুরের যৌবন
দুঃখের যৌবন সে তো ফণা তোলা
সাপের মতো চিরকালীন।

রুমা ঢ্যাং অধিকারী

ব্যবহার উপযোগী মায়াবী লণ্ঠন

এই যে স্রোতের মুখে ক্র্যাকার ভাঙলাম
ছুঁলাম বাঁ-দিকের ও-কার

কিবোর্ডে ক্রটির আঙুল তখন শাসকের ভূমিকায়
দণ্ডহীন স্বভাবকে নিয়ে গেল 'W'-র কাছে

'W'-ই তো সেই বাঁটুল দি গ্রেট

তারই নুটিটি চেপে
হরিণ তুলে নিল ব্যবহার উপযোগী মায়াবী লণ্ঠন

অনুঘটিত এই অম্লান
রুগ্ন শব্দের পাশে দিনহীন রাতহীন তবে এক প্লুটোগ্রহ

শুভাশিস সিনহা

নবান্ন

আপাতত ধান কাটা হোক,
খড়ে খড়ে বাওকুড়ানি খেলায় মজুক,
আকাশ কুয়াশা-ঢাকা,
তবু নীল শাড়ি পরে মেয়েরা হাঁটুক,
পায়ের পাতার নিচে আধেক শিশির আর
আধোমাটিবালু,
পেটে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে
শিশুর থুতনিখানা দেখুক গর্ভিনী,
আপাতত সব্জিগুলো আরও একটু সবুজ থাকুক,
আমাদের বয়সের মতো,
আমরাও বাড়িনি এতটুকু,
ভেতরে সবুজ প্রেম দূরে দূরে পোড়াসোনারঙ দেখে হাসে,
কাস্তের ডগায় ঘুম, কোদালে কোদালে ভুল খননের দাগ,
তবু মাটির ভেতর হৃৎপিণ্ড আছে,
ধান পেকে চাল হলে তা-ই খেয়ে রক্ত বাড়ে তার...
আপাতত খেত ভ'রে থাক।

মাহফুজা অনন্যা

স্বাধীন ভেক্টর

সাদা হাতির শরীরে পরাচ্ছেন বাতাসবন্ধনী
বক্রচলন পুরুষ; আপনারা স্বাধীন ভেক্টর
পালের গাভির ওলানে নজর দিলে
দ্বন্দ্বের ভ্রামকে দীপন তীব্রতা কী করে বুঝবেন?

আসুন, প্রতিসরণে জেনে নিই হৃদয়জ ডপলার।

ভার্নিয়ার ধ্রুবক শূন্য যদি,
প্রধানস্কেলপ শূন্য করে জানিয়ে দিলেন
আপনাদের কোনো মানসিক ক্রটি ছিল না!

তাপস চক্রবর্তী

লাল শাড়ি

একদিন পুড়ে যেতে যেতে
ডেকেছি তোমার তুমিকে হাজার হাজারবার...
ছায়ার মতো শোনোনি তুমি
আমার ঠোঁটের কোণে লুকানো আর্তনাদ।

মাতাল বৃষ্টি শেষে রোদের মতো
এই শহরে নতুন আমি–
রোজ দেখি ব্যস্ত তুমি
লাল শাড়িতে ভিজে আসো যখনি।

মালা

রঞ্জন মৈত্র

কাবাড়িওয়ালার পাল্লা

শুরু হয়
যে যা যেমন আলো
পর্দার সরণ অবিস্মরণ খোলা
চলে যাও তোমার নকাব তুমি
কাঠ প্লাই ও স্লাইডিং যাও
একটি নিখুঁত ব্রেক খাদের কানায়
মরা হয় তারপর মড়া
যথা অযথা কৌমুদী ব্যাকরণ
কাবাড়িওয়ালার পাল্লা বানান ছাড়াই
চুরি করছে হাসছে অভিশ্রুতিতে
সবই বাড়িতে থাকে বাড়িটিও
বাটখারা ওজন দাঁড়ি যায়
শুরু হয়
খুঁটে খাওয়া ছাদ ছাত
পায়রারা আসে বানান ও শস্যদানায়
আলোরা স্লাইড করে
মরে যায় চুপচাপ যে যা যেমন

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

নিছক সান্দ্র প্রেমের গল্প

অভাবনীয় বলে তো কিছু ছিল না–

প্রমত্ত জ্যোৎস্নায় উড্ডীন সার্ডিনের মতো
সেজেছি মাতাল চন্দ্রভূক
লিখি লিখি করে আজও আঁকা হলো না–
পোশাকি চাঁদ সদাগর নির্মাণ

কেবল প্রক্ষিপ্ত বাণে খুঁজেছি, হরিণীর মন...
উপবন তোলপাড় করে মেখেছি, অরণ্যচারি অন্ধকার

গল্পটা নিছক শিকারির নয়
তার মধ্যে মিশে গেছে, আমার ঐহিক সান্দ্র প্রেম...

অজয় রায়

একা

আমিও মৌরি বাগান। চুপচাপ পাখি। একটি নামের মতো একা।

আমার গল্পগুলো একটু রাত রাত। কিছুটা তারার সমান।
কিছুটা অন্য ঋতু।

রঙ থেকে কিছুটা দূরে পড়শিপাড়া। তুমি তা জানতে।
বলতে কুটুম পাখি সেও কিছুটা সকাল।

ফুটে আছে শান্তিনিকেতন। দূরে। একটা নিজস্ব বাতাস এ পাড়া ওপাড়া করে।

আমি কাকে যেন লিখি। টুপ করে একফোঁটা জল পড়ে।
আমি নতুন এক আলোকবর্ষে হাত রাখি।

রঞ্জনা ভট্টাচার্য

হলুদ কিন্নরী সুখ

কিন্নরী রসমাধুরী ও আঁচলে হলুদের দাগ
মিশ খায় না, দামিনী,
তাই তোমার কাছে আমার খিদে রেখে যাই,
রেখে যাই পুকুরঘাটের উপকথা,
বহুবার শক্তিশেল বুকে নিয়েছি,
এখন নিভৃতে চুমুক দিচ্ছি পরাশক্তিতে,
জল ও নেশাতুর আমার চুমুকে...

কতবার শূন্যতাকে
শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাতে গিয়ে
স্নেহ এসে ছিঁড়ে দিয়েছে পাতা,
ঘুমোতে দেয়নি আদিম ভাষায় লেখা স্বপ্ন,
আমার অসম্পূর্ণ হলুদ ছোপ ধরা আঁচল
আমার অসম্পূর্ণ কিন্নরী চুম্বন...

এক লহমা বিদ্যুৎ আলিঙ্গনে হলুদ কিন্নরী সুখ

মাহফুজ রিপন

পাখিজনম

পৃথিবীর যেখানে উড়ে যাই না কেন
শরীরটা আড়াল থাকে হৃদয়টা নয়।

কাকের মতো তাপ দিতে থাকি
চিলের কাছে ছিনতাই হয়ে যাই।

টর্চের আলোর মতো সে ঘুরে তাকায়
চোখ বুজে–শুধু বাসা খুঁজতে থাকি।

সৌম্য সালেক

নাচের মেয়েরা

যখন নাচের মেয়েরা মন দিলো চোখে;
ব্যাকুল বুক থেকে ঝরে পড়ল প্রেমের অক্ষর!

যখন মন দিলো আঙুলে;
শিরায় শিরায় বেজে উঠল ঝড়ের করতালি!

ওরা যখন মন দিলো কটিতে;
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল আরবি অশ্বের শ্বাস!

যখন মন দিলো চরণে;
অতীত-আগামী ভুলে মেতে উঠল মাতালেরা!

এবং ওরা যখন মন দিলো হৃদয়ে;
তুমুল বাতাসের রাসে ছিঁড়ে পাল–
জলে জাগে যুবকেরা!

দিকচিহ্ন রেখে যায় যে ধ্রুবতারা

কাজী রাফি

ছোটগল্প

বিশ্রামঘর থেকে গ্যালারি পর্যন্ত আলোচনা সালেহা তাবাসসুম নামের একটা মেয়েকে কেন্দ্র করেই। দ্য লাইট হাউজ নামের স্কুলটির বয়স মাত্র পনেরো বছর হলেও ভালো ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে এতদ্ অঞ্চলে বিখ্যাত হয়ে ওঠা এই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী সালেহা তাবাসসুম। স্কুলটিতে যারা পড়াশুনা করে তারা হয় মেধাবী, নয়তো ধনী পরিবারের। আজকাল সরকারি ভালো স্কুলগুলোতে ভর্তি না করিয়ে পদধারীরাও এই স্কুলে কেন করেন, তার প্রাথমিক কারণ এই স্কুলের ভালো ফলাফল হলেও কয়েক বছর হলো সেই কারণে ঘৃতাগ্নি হয়ে উঠেছে সেই বাতিঘর নামের বিখ্যাত পরিবারের এক সন্তানের এই স্কুলে সংযুক্তি। স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রী, সহপাঠী তো বটেই, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আয়া-পিয়ন সকলের মন-মগজ এবং মাথায় সালেহা তাবাসসুমের প্রতি রয়েছে বিশেষ আগ্রহ। শহরের সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিবারের তাবাসসুম অলওয়েজ টপিক অব দ্য ডে।

তারা মনে করেন সালেহা তাদের আভিজাত্যের পতাকার সাথে ক্ষমতার প্রতীকও বটে।

এসব জানার পর সুস্মিতা তার সহপাঠীকে প্রশ্ন করল,

তাহলে?

অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম এবং তৃতীয় হয়ে মাত্র কয়েকদিন আগে দ্য লাইট হাউজ স্কুলে ভর্তি হয়েছে সুস্মিতা তাবাসসুম এবং তারই বোন তারান্নুম তাবাসসুম। সুস্মিতার এই প্রশ্নের উত্তরে তার মাত্র বন্ধু হয়ে ওঠা ফারজানা বলল,

এই শহরে দেখার মতো রয়েছে খুব সুন্দর একটা বাড়ি। মেয়েটা সেই-ই বাড়ির একমাত্র কন্যাসন্তান কিনা! সেই বাড়িতে রয়েছে নাকি অদ্ভুত এক বাতিঘর। কোনো এক সময় দূর গ্রাম থেকেও জ্বলতে দেখা যেত সেই ঘরের বাতি। সেই বাসাটার নামেই তো স্কুলটা! বুঝলে?

ওহ, আচ্ছা। আমিও এমন কিছু শুনেছি।

তুমি কোন স্কুল থেকে এসেছ?

বেগম রোকেয়া গার্লস থেকে।

তোমার বাবা বদলি হয়ে এসেছে?

আমার বাবা নেই!

ওহ, তোমার মা-ই তাহলে...

আমার মা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে কাজ করে... মা'র দুটা গরুর খামারও আছে।

সুস্মিতার কথা শুনে ফারজানা যেন ভূত দেখার মতো ভাষাহীন হয়ে উঠল। তবে, কিশোরী হলেও তার কেন যেন মনে হলো, সুস্মিতার চোখ-মুখ বলছে না সে তেমন কোনো সাধারণ পরিবারের মেয়ে। তার চোখের গভীরে

কোথায় যেন একটা বাতিঘর লুকিয়ে আছে। আর কী অদ্ভুত ব্যাপার তাদের দুই বোনের নামের শেষে সালেহার মতো 'তাবাসসুম' শব্দটা জুড়িয়ে দেওয়া! কিন্তু সেই মেয়েটা এত গরিব পরিবারের হয় কী করে? তাদের নাম এত সুন্দর হয় কীভাবে? বিস্ময় লুকিয়ে সে বলল,

ওহ, যদিও তুমি ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছ বলে একটা স্ট্যাটাস তো তোমার আছেই... তবু এই কথা ক্লাসের আর কাউকে বলো না।

কেন?

এই স্কুলের ব্যাপারস্যাপারগুলো কেমন যেন! আমি ঠিক বুঝাতে পারব না তোমাকে।

ফারজানা সুস্মিতাকে তার মায়ের পেশা সম্পর্কে কিছু না জানাতে বললেও সেই খবরটাই সবার আগে চাউর হয়ে গেল। শবনমের সামাজিক এবং আর্থিক সঙ্গতি মেয়েকে এই স্কুলে ভর্তি করানোর মতো না হলেও তিনি কেন এই স্কুলে তার দুই মেয়েকে ভর্তি করানোর দুঃসাহস দেখালেন তা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ পড়লেন বিরাট ফাঁপড়ে। পরিচালনা পর্ষদের মাথাব্যক্তিরা বিষয়টি নিয়ে এত মাথা খারাপ করলেন যে, পরেরবার থেকে যারা এই স্কুলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাদের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড জানার জন্য ভর্তি ফর্মে আলাদা কলাম সংযুক্ত করলেন।

আর শবনমের এই উচ্চাভিলাসটুকু বিশেষত সমাজের উচ্চবিত্তের বিরক্তির কারণও হলো। যেখানে বিখ্যাত বাতিঘরের সত্তাধিকারীর পুত্র-কন্যা পড়াশুনা করে সেখানে সাধারণ পরিবারের দুই কন্যার ভর্তি তাদের আভিজাত্য আর সম্মানে যেন বড় আঘাত হয়ে দেখা দিলো। মেয়েদের নামের পাশে তাবাসসুম জুড়ে দিয়ে মহিলা বাঁধিয়েছেন আরো বড় ফ্যাসাদ।

২.

বলাবাহুল্য সেই বার্তা পৌঁছাল বাতিঘরের সত্তাধিকারী ফরহাদ খানের কাছে। তবে এ নিয়ে তিনি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না, নাকি এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলে, বিরক্তি প্রকাশ করে তিনি নিজের অতীতটাকে উন্মোচনের দায় নিতে চান না, তা স্পষ্ট নয়। এই ফালতু বিষয়টা জানার পর সন্ধ্যার পর থেকে তার হৃৎস্পন্দন বাড়তে থাকল। যেসব ভাবনা একজন মানুষ সহসাই ভাবেন না -তার মাঝেই তিনি ডুবে গেলেন। মানুষ? কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই প্রাসাদে তিনি জবাইকৃত গরুর ফুসফুসের ফুসফুস বর্ণের টেবিলটার দিকে তাকিয়ে, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ঘেমে উঠছেন। তিনি মাত্র জবাইকৃত একটা গরুর ফুসফুস আর যকৃতের ঘ্রাণও পেলেন। জড় হলেও অভিজাত এই টেবিলটা আজ যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে।

না, এই টেবিল বদলে ফেলতে হবে। মনে আছে এই বাড়িতে যখন সে প্রথম এসেছিল তখন অবাক বিস্ময়ে এই টেবিলসহ বাড়িটার প্রতিটা দামি বস্তু সে দেখছিল আর বিস্মিত হচ্ছিল। এটা কি স্বর্গপুরী? বাসার বাইরে যে বিশাল সাজানো বাগান, বাগান পেরিয়ে পুবদিকের শেষমাথায় একটা বাতিঘর সেই বাতিঘরে সন্ধ্যায় জ্বলা বাতিটা ছিল তার কাছে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য। ফরহাদ তখন ভাবত, সন্ধ্যা হলেই বাতিটা এমনিতেই জ্বলে। তবে তা জ্বলে শুধু অন্ধকার হলেই। খুব সম্ভবত আকাশের পরি আর হুরগণ এই বাতি জ্বালানো নেভানোর কাজ করে। আর কখনো বিদ্যুৎ চলে না যাওয়া এই বাড়িটার বিদ্যুৎ আসে জান্নাত থেকে।

গ্রামের প্রান্তিক আর গরিব পরিবার থেকে আসা ফরহাদ বিদ্যুতের খুঁটিনাটি বিষয় না বুঝলেও জান্নাত, হুরপরিদের ব্যাপার ভালো করেই সেই কিশোর বয়সে বুঝতে শিখেছিল। এই বোঝার ফলটা মন্দ হয়নি। যে তার মনিবের কয়েক একর বাড়ির শেষপ্রান্তে এক শ্যালোমেশিনের ঘর দেখে গ্রামীণ জীবনকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে বিভোর হয়েছিল, সেই মনিবের বাড়িটা দখলের কুমতলবটাও তার আত্মায় ভর করেছিল—স্বর্গ এবং হুরপরিদের ভোগ-লালসার সুপ্ত বাসনা থেকেই।

গ্রাম থেকে আসার পর বেশ কিছুদিন বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখার কৌশল, নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষায়গুলো শেখাতে ফরহাদকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। বাসাটার ঘাসে, লতায়, নাম জানা, না জানা অনেক ফুলে-ফলে ভোরে যে বুনো গন্ধ ভেসে থাকত তা ফরহাদের কিশোর মনকে শান্ত করত। তার সুন্দর এই মনটার সৌন্দর্য বিকল হতে শুরু করল সেই দিন থেকে যেদিন সে দরজার ফাঁক দিয়ে গোপনে বাগানের তরতাজা অনেক ফল বিক্রি করে কিছু টাকা কামাই করল। এই বাড়ির মালিক জ্ঞানী আর শিক্ষিত, কিছুটা অভিজাত পরিবার এবং নির্দিষ্ট আত্মীয়ের বাসা ছাড়া কারো সাথে তেমন একটা ওঠাবসা করেন না। তবু, তাদের বদান্যতা, উদারতা, জ্ঞানচর্চা এবং বিনয়ের যে সুনাম চর্চা করে—সময় মনে হয় তাকেই ধারণ করেছে বলে তাদের বাড়িটার নাম হয়েছে বাতিঘর।

শোয়েব সাদমান এবং তার পরিবার বাড়ির ফল বিতরণ করেন গরিবদের মাঝে। বড়লোকদেরও তো এসব রামবুটান, বেরি না টেরি, কমলা—এসব গাছের তাজা ফল খেতে ইচ্ছা করে! তবে দিন যত গড়াল, তা আর ফল বেঁচা টাকার সন্তুষ্টি অথবা আত্মতৃপ্তিতে থেমে থাকল না। জাদুঘরের মতো একটা বিরাট ঘরে সংরক্ষিত বিচিত্র সব মূর্তি-অলংকার এসবের ভিতর তার চোখ গেল। একস্থানে একসাথে অনেকগুলো মূর্তির মাঝে থেকে বিদেশ থেকে কিনে আনা একটা দামি পাথরের পরি তার নজরে এলো। পনেরো বছর ধরে বাতিঘরে কাজের সূত্রে শহরে অনেক মানুষের সমীহ অর্জন করেছে তরুণ ফরহাদ। তারা বাতিঘরের গল্প বিস্মিত হয়ে শোনে। একদিন একজন অধ্যাপক ফরহাদকে থামালেন। কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে বসে চা পান করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন,

উনার বড় ছেলেটা কী করে?

আমেরিকায় পড়তে গিয়ে সেখানেই বিয়ে করেছে। এক ইউনিভার্সিটিতে নাকি মাস্টারি করে। মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে মেয়েটা।

আর চৌধুরি সাহেব আর তার মিসেস? আহা! এক সড়ক দুর্ঘটনা কীভাবে কেড়ে নিল তাদের সব উচ্ছ্বাস। দুর্ঘটনায় জামাই বড় মেয়েটাকে হারিয়ে এখন কেমন তাদের জীবন?

চাচাজান-চাচি সকালে পাঁচিলের সাথে রাস্তা ধরে এক ঘণ্টা করে হাঁটে। তারপর সারাদিন নাতনি দুজন আর বই-পত্তর নিয়ে দিন কাটায়।

আহা, মেয়েটা বড্ড দয়াবতী ছিল। এত অল্প বয়সে মেয়েটা ফুটফুটে দুজন মেয়েকে রেখে এভাবে মারা যাবে, কে ভেবেছিল? তবু, এই পরিবারটার জন্য আমি সবসময় গর্ববোধ করি।

এই কথাটা ফরহাদের সহ্য হলো না। সে বিরক্তির সাথে কাপটা রেখে উঠে এলো। পণ করল, একদিন এই শহরের লোকজন উঠতে-বসতে তার নাম জপ করবে। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কথা এই পৃথিবীর আত্মা মনে হয় শুনে ফেলে। মি. এবং মিসেস চৌধুরী এক বছরের জন্য ছেলেমেয়ের কাছে থাকার জন্য বাইরে গেলেন। এক যুগ ধরে তাদের পাশে থাকা ফরহাদকে বাড়ির দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। তাদের কাছে অনেক বছর ধরে থেকে মেয়ের মতো হয়ে ওঠা আফরোজাকে ডেকে বললেন,

বাচ্চা দুজনকে দেখে রেখো। কিছু লাগলে ফরহাদকে বলো।

আপনারা ভাববেন না। ওরা আমাকে মা বলে ডাকে। আমি বিয়ে-টিয়ে না করেও কখন ওদের মা-ই হয়ে গেছি।

এটা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা আছে। আমরা আগে ফিরে আসি। তুমি নিজ থেকে কিছু করে বসো না।

তারা চলে গেলেন। এই সুযোগে এক রাতে ফরহাদ জমির দলিল বের করে একাকার করে ফেলল। শহরে, শহরের বাইরে সাদমান পরিবারের আদি আমলের সব জমি যার খোঁজ সাদমান জানেন না তার অনেকগুলোই বিক্রি করার উদ্যোগ নিল। আরো বড় স্বপ্ন পূরণের জন্য ঢাকার পলিটিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করে নিজেকে সাদমান সাহেবের আপন ভাতিজা বলে পরিচয় দিলো। বিভিন্ন ভাইরাল বিষয়, ফেসবুক, অসংখ্য-টিভি চ্যানেলের আজেবাজে অনুষ্ঠান আর খবরের তাণ্ডবে শহরের অধিকাংশ মানুষের মনন মরা ঘাস হয়ে ওঠায় তারাও মনে করতে পারল না, বাতিঘরের পুরনো বংশ-পরম্পরার ইতিহাস। বছরের ব্যবধানেই তারা ভুলে গেল বাতিঘরের জীবিত এবং একমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ মালিককে। যারা মনে করলেন, তারা অভিজাত পরিবারটির সাথে সংশ্লিষ্ট ফরহাদের হঠাৎ করে ক্ষমতাধর হয়ে ওঠার ইঙ্গিতটুকু বুঝে চুপ হয়ে গেলেন। আত্মবিশ্বাসের বলে বলিয়ান ফরহাদ দেড় বছর ধরে দেশের বাইরে ছেলেমেয়ের কাছে বাস করা সাদমান সাহেবকে বলে দিলো,

বাড়িটা আমি নিজের নামে লিখে নিয়েছি। বারো বছর দখলিসূত্রের আইনে এই বাড়ি এখন আমার। আমার দুই নাতি-নাতনিও ওখানেই আফরোজার তত্ত্বাবধানে বাস করে।

চাচা, ওরা আফরোজা-ফাঁফরোজা না, আমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। আপনার রক্ত কেন চাকরানি-ফাকরানির কাছে থাকবে? ওরা থাকবে এই শহরের ভবিষ্যৎ সাংসদের সাথে।

আফরোজা ছোটবেলা থেকে আমার বড় মেয়ের সাথে থেকেছে। চাকরানী নয়, সে আমার মেয়ের মতোই। বাড়ির অধিকার থাকলে আফরোজার থাকবে। যে ওকে বিয়ে করবে, তার সাথে আমাদের বোঝাপড়া হবে।

এই বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি হলে খুনাখুনি হয়ে যাবে, চাচা। কয়ে দিলাম।

৩.

ফরহাদ নির্বাচনে জয়ী হলো। সাদমান এবং মিসেস সাদমান দেশে এসে অনেক চেষ্টা করেও নিজের বাড়িতেই উঠতে পারলেন না। নিজের প্রাণপ্রিয় নাতনীদের সাথে দেখা করার চেষ্টা করেও লাভ হলো না। তবে, ভদ্রতা করে একটা তিন তারকা হোটেলেই ফরহাদ তাদের অবস্থান করতে দিলো। পুলিশ, প্রশাসন যেখানেই তিনি গেলেন, সবাই আশ্বাস দিলো,

স্যার, স্যার... সব ঠিক হয়ে যাবে, স্যার। আমরা সব দেখব স্যার...

বলে আর কিছু তো করলেনই না, উলটা এসব নিয়ে আর হাঙ্গামা না করে মেয়ে দুটোর জীবন অনিশ্চিত না করার পরামর্শ দিলেন। তাঁর দীর্ঘশ্বাস প্রলম্বিত হলো। কয়েকদিনের সংগ্রাম শেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে মিসেস সাদমানকে সব খুলে বললেন। তাঁর স্ত্রী তাকে বললেন,

এসবের পেছনে আর না দৌড়ে আফরোজার জাতীয় পরিচয়পত্রে তোমাকে-আমাকে বাবা-মা হিসেবে দেখাতে পারবে? তারপর ওর একটা পাসপোর্ট করবে?

সাদমান চমকে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। অনেকক্ষণ পর তাঁর কাছে সব পরিষ্কার হলো। তিনি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন,

এ রাষ্ট্রের আগা থেকে গোড়া পুরোটাই নষ্ট। এখানে কাগজপত্র বানানো খুব সহজ বলেই আমরা সব হারিয়েছি।

আমরা কিছুই হারাইনি। জমি-ভূমি ভালোবাসার চেয়ে বড় কোনো সম্পদ নয়। আফরোজা আজ লুকিয়ে এসেছিল আমার কাছে। আমাদের মেয়ে আর আমার দুটো নাতনীর মা হিসেবে শবনমকে আমেরিকায় যাওয়ার প্রস্তাব দিতেই সে আমাকে জড়িয়ে কান্না করে যা বলেছে, তা আমার কাছেই থাক। মেয়েটার ভালোবাসার চেয়ে আমাদের বাতিঘরটা বড় কিছু নয়, গো।

শবনম?

শবনম চৌধুরি। জাতীয় পরিচয়পত্রে আফরোজা নামটা বদলে ফেলবে।

তাঁরা ফিরে গেলেন দেশ ছেড়ে। কিন্তু সেই রাতটা কাটানো তার জন্য কঠিন হয়ে উঠল যে রাতে আফরোজা তাঁকে ফোন করে বলল,

বাবা, বাচ্চা দুজনকে নিয়ে আজ রাতেই আমাকে পালাতে হবে। ফরহাদ ওদের নিয়ে ভয়ংকর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। মোবাইল অ্যাপস দিয়ে তার সব কথাবার্তা আমি রেকর্ডও করে নিয়েছি। আপনি ভাববেন না। আমি আমার যুদ্ধটা হারব না, আপনারা নিশ্চিত থাকুন।

তিনি শুধু আফরোজাকে বলেছিলেন, মেয়েদের নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যেতে। নতুন পরিচয়পত্র অনুসারে শবনম চৌধুরি নামে খোলা অ্যাকাউন্ট নাম্বার তিনি পাঠাতে বলেছিলেন তাঁর ছেলেমেয়ের কাছে। বলেছিলেন,

অর্ণব তোদের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছে। বারোটা বছর! অনেক লম্বা সময় মা, সাবধানে থেকো।

এক কীটতুল্য মানুষের কাছে এমন পরাজয়, জীবনে এমন পলায়নপরতা মেনে নিতে পারলেন না প্রবল ব্যক্তিত্বের শোয়েব সাদমান চৌধুরী। সেই রাতে শীতের মধ্যে তিনি বারবার ঘামলেন এবং এক সময় তার শ্বাস রোধ হয়ে এলো। তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

৪.

এক টিফিনের ফাঁকে। সালেহার সহপাঠীরা ঘিরে রেখেছে তাকে। শহরে আসা কোনো নায়িকাকে যেভাবে ঘিরে রাখে তার ভক্তকূল। একই স্কুল পোশাক পরিহিত হলেও সালেহার পোশাক কোনো দর্জি বানাল, তা নিয়ে তাদের অনেক প্রশ্ন। কেউ তার চুলের ক্লিপ দেখে মুগ্ধ হচ্ছে, কেউ মুগ্ধ হচ্ছে তার কানের সাধারণ দুলগুলো দেখে। সালেহা স্কুলের বিরাট বড় মাঠটায় দৌড়ালে তার চারপাশের বান্ধবীরা আকাশে উড়ে চলা বলাকার মতো তার চারপাশে ধনুক অথবা রংধনুর মতো অর্ধ বৃত্তাকার বলয় তৈরি করে যেন উড়ছে। সালেহা এই খেলাটা খেলে খুব মজা পায়, সবাই তাকে ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে এঁকেবেঁকে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছে।

এসবই সুস্মিতা দেখত দূর থেকে। টিউবওয়েলটা থেকে জল ভরিয়ে পেয়ারা গাছগুলোর ছায়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ভয়ে ভয়ে, দুরুদুরু হৃদয়ে সালেহাও একদিন যোগ দিলো সালেহা উৎসবে। মাঠে দৌড়ানোর সময়ই তার ভয়-ডর তো উবে গেলই, সে ঝরনাধারার মতো উচ্ছল হয়ে উঠল। আর তখনই ঘটল দুর্ঘটনা। সুস্মিতার শরীরের সাথে ধাক্কা খেয়ে দুজনই পড়ে গেল মাঠের কার্পেটের মতো ঘাসের ওপর। দুজনের শরীর ঘাসের ওপর পিছলে একই দূরত্ব অতিক্রম করল। তাদের চোখাচোখি হলো। সুস্মিতা ভয় পাওয়া চোখে সালেহার চোখে চোখ রাখলেও সালেহা তার চোখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে দিলো। তার পাশে সবসময় যে অর্ধ বৃত্তাকার বৃত্ত তা ভেঙে ফেলে কাছে আসায় সুস্মিতাকে সালেহার বড্ড আপন মনে হলো। ধাতস্ত হয়ে সে বলল,

ঠিক আছ? সালেহার প্রশ্নে সুস্মিতার ভয় ভেঙে গেল। উত্তর দিলো,

আমি ঠিক আছি? তুমি? ব্যথা পাওনি তো!

সুস্মিতা দ্রুত উঠে হাত ধরে সালেহাকে উঠাল। সালেহা বলল,

এখন থেকে আমাদের সাথে মাঠে আসবে। দূরে থাকো কেন? কেন ভয় পাও?

অন্য বান্ধবীরা তাদের ঘিরে ফেলল। অনেকেই সুস্মিতাকে ভর্ৎসনা করল, একদিন খেলতে এসেই ঝামেলা পাকাল। ছোটজাতকে পাতে তুললে যা হয়!

সালেহা তাদেরকে নিবৃত্ত করল। কিন্তু অনেকের কটু কথা সুস্মিতার হৃদয়কে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলো। তার গালচোখ লজ্জায় রক্তিমাভা হলো এবং ধীর পায়ে সে শ্রেণিকক্ষের দিকে এগিয়ে গেল। তার সেই চলে যাওয়ার দিকে সালেহা চুপচাপ তাকিয়ে থাকল কতক্ষণ। তাকে ঘিরে থাকা বান্ধবীদের উদ্দেশে দিকে ফিরে বলল,

হয়েছে তো! শান্তি পেয়েছ? যাও, এখন ক্লাসে যাও।

সবার চোখের আড়ালে শ্রেণিকক্ষে ফেরার সময় সালেহার মনে পড়ল সুস্মিতার চোখের মতো এত মায়া আর কারো চোখে কোনোদিন সে দেখেনি। মেয়েটার চোখের মতো এত গভীর, এত নিবিড় আর আপন চোখও সে কি দেখেছে কখনো? তার দুচোখ কেন জলে ভরে আসছে, সে জানে না। সমাজের এই নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির যাঁতাকলকে থামানো তার মতো ছোট্ট একটা মেয়ের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। তার মা-বাবাদের সময় কি মানুষ মানুষকে এত অর্থ-বিত্ত আর ক্ষমতা দেখে পরিমাপ করত? কতকিছু ভাবতে ভাবতে সালেহা তার পদক্ষেপকে দ্রুত করে তুলল। আর এই তাড়া সে অনুভব করল, চোখ বেয়ে নেমে আসা অশ্রুটুকুকে শাসন করতে, থামাতে। তবু, মাঠ থেকে শ্রেণিকক্ষ সে কয়েকবার চোখ মুছে নিল।

সেই রাতে বাম কাঁধের ব্যথাটুকু সালেহা লুকাতে পারল না। পারিবারিক ডাক্তার এসে ঔষধপত্র আর গরম জলের স্যাঁক দিতে বললেন। রাতে ঘুমানোর আগে সালেহা জানালা দিয়ে দেখল, আকাশে জোছনার রুপালি আস্তরণ। চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া এই রহস্যময় আলোটুকু কোনো এক কালে বাতিঘরে জ্বলন্ত থাকা বাতি যেন খুঁজেই ফিরছে। সালেহা সেই বাতিঘরের গল্প অনেক শুনেছে। কিন্তু কোনোদিন শত শত মিটার উঁচুতে বাতিটা আর জ্বলতে দেখেনি। নিশ্চুপ প্রান্তরে চাঁদের রুপালি আলোয় নিজের নরম বিছানায় আনন্দময় ব্যথাটুকু উপভোগ করতে করতে তার সুস্মিতার কথা মনে পড়ল। মেয়েটার চোখ দুটোতে জমে থাকা স্নিগ্ধ আলোটুকুকে সে কেন জানালার বাইরে চোখ রেখে সেই বাতিঘরের উঁচুতে এখন খুঁজছে তা সে জানে না। রাত দশটার পর রাজ্যের ঘুম আসে তার চোখে। সারারাত জ্বলে যায় যে নীলাভ তারা তা যেন আজ সালেহার ঘুম কেড়ে নিয়ে গেছে। মনে মনে সে পণ করল, ডাক্তারের দেওয়া বিশ্রামের তিনদিন পর স্কুলে গেলেই সে সুস্মিতাকেই কাছের বন্ধু করে নেবে। কিন্তু তিনদিন পর স্কুলে গিয়েই সালেহা সম্মুখীন হলো এক অদ্ভুত ঘটনার।

সকালের অ্যাসেম্বলিতে উপাধ্যক্ষ ঘোষণা করলেন, বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ 'শৃঙ্খলা ভঙ্গের' নীতিমালার আওতায় সুস্মিতাকে টিসি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কী সেই শৃঙ্খলাভঙ্গ তা তিনি উল্লেখ করলেন না। উপাধ্যক্ষের ঘোষণা শুনে সালেহা বুকে যেন বাজ পড়ল। শীঘ্রই তারা এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবেন।

এই স্কুলটাকে সালেহার বড্ড বন্ধুহীন আর নির্জন মনে হলো। মনে হলো, তার চারপাশে যত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সবাই প্লাস্টিকের তৈরি। ডানের সারিতে দাঁড়ানো সুস্মিতার দিকে সে আড়চোখে তাকাল। সুস্মিতাও ছলছল চোখে সালেহার চোখে চোখ রাখল। তার চোখও ছলছল করে উঠল। সে শিখে গেল, কারো সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য নয়, তার জন্ম হয়েছে–মানুষের মিথ্যা প্রশংসা আর স্তুতি শুনে শুনে জীবন পার করার জন্য। সুস্মিতার চেয়েও তার নিজেকেই বেশি অসহায় এবং দুর্ভাগা মনে হলো।

টিফিন পিরিয়ডের সময় সালেহা কাউকে কিছু না বলে বাড়ির পথে হাঁটা আরম্ভ করল। ড্রাইভার এসে তাকে গাড়িতে উঠতে বললে, শান্ত আর প্রাণোচ্ছল মেয়েটা আজ বিষণ্ন আর খিটমিটে মেজাজের বখে যাওয়া কিশোরীর মতো খেঁকিয়ে উঠল।

৫.

বাতিঘরের দারোয়ান খেয়াল করল আগে-ভাগেই স্কুল থেকে বাসায় ফিরে সালেহা পোশাক না বদলিয়েই প্রখর রোদ আর ভ্যাপসা গরমের মাঝেই দূরের বাগানটায় পায়চারি করছে। তার দিকে শকুনের মতো তাকিয়ে থাকায় সালেহা দ্রুত পায়ে কাছে এসে তাকে রোষানল ভরা দৃষ্টিতে বলল,

আমার দিকে যদি আর তাকিয়েছেন... উলটা ঘুরে বাসার দিকে মুখ করে থাকেন...

এই বাড়ির সবচেয়ে শান্ত, বিনয়ী আর ভদ্র মেয়েটা এমন রুক্ষ স্বরে করে কথা বলছে দেখে দারোয়ান অবাক হলো। ভয় পেয়ে বাধ্যানুগত কর্মচারীর মতো সে বাড়ির দিকে এমন করে তাকিয়ে যেন সেদিক থেকে অক্ষিগোলকও না নড়ে। এই সুযোগে সালেহা প্রায় দৌড়ে বাগানের দরজার কাছে এলো। ভিতর থেকে খিল আঁটা গ্রিলের দরজা খুলে কেন যেন রাস্তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। এদিকটায় এই সময় কেউ আসবে না সে জানে–তবু সে ভয় পেল না মোটেও। এবং মনের গহিনে ডেকে যাওয়া যে অর্বাচীন, নিজের কাছেই অজানা ডাকটুকুর জন্য সে বাইরে অপেক্ষা করছিল তা সে স্পষ্ট দেখতে পেল। দূরে, দুই বিষণ্ন ছায়াকে সে রাস্তা ধরে হাঁটতে দেখল। ছায়াদুটো স্পষ্ট হলে সে আনমনে, অবচেতনে যাদের জন্য গ্রিলে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছিল তাদেরকেই দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল।

হাতের ইশারায় সে সুস্মিতা আর তারান্নুম দুই বোনকে বাড়ির ভিতর যেতে ইশারা করল। যত না আগ্রহ তার চেয়েও সালেহার আদেশ পালনের জন্যই দুই বোন বাগানের ছোট্ট দরজাটি দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। চারদিকে তাকিয়েই সুস্মিতার মনে হলো, এতদিন পর এই জগতের সবচেয়ে চেনা জায়গাটা সে দেখছে। তারান্নুমের স্মৃতি ধোঁয়াশার মতো করে অতীতকে ঠিক দেখতে না পারলেও এই জায়গাটায় তার কী যেন লুকানো আছে–তা ঠিক সে বুঝতে পারছে না। এখানে দুপুর গড়িয়ে গেলেও এর ছায়ায় ঘাস-লতা-পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়া শিশিরের ঘ্রাণটুকু তার নাসারন্ধ্র ঠিকই টের পেল। পড়াশুনা, জীবনের প্রয়োজন এসবের সাথে তার যে কিশোরী আত্মাটা মানিয়ে চলছিল–তা প্রাণচাঞ্চল্যে জেগে উঠল। সালেহা বলল,

এই বাসায়, বিশেষত এই বাগানের দিকটায় কাউকেই আসতে দেওয়া হয় না। এসো, আমরা ঐ ফোয়ারার পাশে জয়তুন গাছটার কাছে যাই। সালেহা, বাড়িটার দর্শনীয় এবং উল্লেখযোগ্য যা কিছু সেসবেরই বর্ণনা একটার পর একটা দিয়ে যাচ্ছিল। সালেহা বলল,

ঐ যে সিঁড়িটা আকাশের দিকে বেয়ে বেয়ে অনেক উঁচুতে যেখানে মিলেছে–ওখানে একটা বাতি আছে। ওটা অনেকদিন থেকে নষ্ট। বাতিটার নাকি বোতাম আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ কথায় সুস্মিতা অনেকক্ষণ সালেহার চোখে তাকিয়ে থাকল। কী যেন বলতে গিয়েও ঠিক তার যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে না। সালেহা তার এই দৃষ্টিকে অবাক হওয়ার মতো স্বাভাবিক বিষয় বলেই ধরে নিল। বলল,

তুমি আমাদের বাসায় যত পুতুল আছে তা দেখলে অবাক হবে? সুস্মিতা সাথে সাথেই বলল,

একটা ডানাওয়ালা পরি আছে, তাই না?

সালেহা এ কথায় অবাক হয়ে সুস্মিতার দিকে তাকাল। সুস্মিতা এ বাসায় না এসেও কেন সব জানার ভাণ করছে, তা তার বোধগম্য হলো না। সালেহার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। সে বলল,

তুমি তো এই বাসায় আসোনি, তাহলে? না, ঠিক তেমন পুতুল পরি আমাদের বাসায় নেই। তবে বাড়ির সামনে, বাগানে ঢোকার দরজায় আর এখানে সেখানে রোমান, গ্রিকের সব বিখ্যাত চরিত্র আর সম্রাটদের এবং আলমা ম্যাটার নামের মূর্তি আছে। চলো তোমাদের দেখাই।

সুস্মিতার প্রাণোচ্ছলতা কমে এলো। শান্ত পদক্ষেপে সে সালেহার পিছু, পিছু তাকে অনুসরণ করল। তার ছোটবোন তারান্নুম ভীতু হরিণীর মতো তাকে অনুসরণ করল। মূর্তিগুলোকে দেখে সুস্মিতার কেন মনে হচ্ছে–এইসব মূর্তি হলেও এই চরিত্রগুলোর রক্ত-মাংসের যে রূপ তার সাথেই তার বাস জন্মের পর থেকে। আলমা-ম্যাটার নামের যে মূর্তিটা সেই বাম হাত কাটা আলমার কাছে এসে সে দাঁড়িয়ে গেল। তার সাথে আজ আবার কথা বলতে ইচ্ছা করল। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সে কি এতদিন তাহলে স্বপ্ন আর অবচেতনে এই বাড়িটার ভিতর বাস করেছে? কথা বলেছে আলমার সাথে? সুস্মিতা এবার মূর্তিটার কাটা বাম হাতের হলোটার ভিতর আড়চোখে কিছু একটা দেখল। ঠিক সেখানেই আছে ওটা। সুস্মিতা নিশ্চিত সালেহা বুঝতে পারেনি সে কী দেখল!

ফোয়ারার কিনারে দাঁড়িয়ে ওরা এক অশ্বারোহীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে ছিল। তিনজন কিশোরীর কল্পনাচোখ তখন এমন একজন অশ্বারোহীকে নিয়ে তাদের স্বপ্ন ছুটিয়ে চলছে। প্রবল পিপাসার কথা সুস্মিতা আর তারান্নুম এখানে এসে ভুলেও গেল। কতক্ষণ ওরা ওভাবে ঘুরল ঠিক খেয়াল করতে পারল না। এই ফাঁকে এক কণ্ঠ তাদের স্বপ্ন-কল্পনাকে তছনছ করে হাঁক ছাড়ল, সালেহা?

তারা তিনজন একসাথে ঘুরে পিছনে তাকাল। গোলাপি মার্বেল পাথরে রোদ-ছায়ার খেলা পথটায় এসে দাঁড়িয়েছেন একজন মহিলা। এই বাড়ির সবকিছুর সাথে স্বপ্নে-কল্পনায় সুস্মিতার এত বসবাস হয়েও এমন কোনো মানুষকে কেন সে দেখেনি, তা তার বোধগম্য হলো না। এটা কি তার সেই বাড়িটার মতো বানানো আরো একটা বাড়ি? তাহলে আলমার কাটা বাম হাতের গর্তে সে ওটা দেখল কীভাবে? মহিলার গুরুগম্ভীর গলা আবার হাকল,

ছিঃ সালেহা! এই তোমার রুচি। এই বাড়ির মেয়ে হয়ে তুমি এত নিচু শ্রেণির মানুষদের বন্ধু বানিয়েছ?

দারোয়ান, বাগান পাহারাদার সব ছুটে এলো। তারা সুস্মিতা আর তারান্নুমকে বাসার বাইরে নিয়ে যাওয়ার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকল। সালেহার ঝাপসা চোখে মাথা নত করে বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়া সহপাঠী দুজন ক্রমশ ছায়ার মতো ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেল। আহা, তারান্নুম বারবার পিপাসার কথা বলছিল! ছায়াদেরও কি পিপাসা থাকে?

৬.

স্কুল কর্তৃপক্ষ শবনমকে স্কুলে এসে টিসিসংক্রান্ত বিষয়গুলো বুঝে নিতে বলেছিল। সব শেষ করে বাসায় ফিরে যখন তিনি দেখলেন তার মেয়ে দুজন তখনো বাসায় ফেরেনি তখন থেকেই অস্থির হয়ে স্কুলের পথটাতে কয়েকবার রিকশা নিয়ে চক্কর দিলেন। অবশেষে তিনি বাতিঘরটার শেষ মাথায়, মূল রাস্তার সংযোগ সড়কে একটা সাঁকোর ওপর সিমেন্টের বেঞ্চে দুই বোনকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দৌড়ে তাদের কাছে গিয়ে শুনলেন, তারান্নুম বাতিঘরটার দিকে তাকিয়ে বলছে,

বাতিটা আর জ্বলে না। কেন আপু? সুস্মিতা উত্তরে বলছে,

ওটা জ্বালানোর বোতামটা কোথায় লুকানো, তা আমি জানি! •

কাজী রাফি ॥ কথাসাহিত্যিক

সেলিনা হোসেন

সাক্ষাৎকার

দেশভাগের ফলে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেলাম

সেলিনা হোসেন

সেলিনা হোসেন (জন্ম ১৪ জুন ১৯৪৭) বাংলা ভাষার একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংকটের সামগ্রিকতা। বাঙালির অহংকার ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তার গল্প-উপন্যাস ইংরেজি, রুশ, মেলে এবং কানাড়ি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ২০১৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রিতে ভূষিত করে। অন্যান্য পুরস্কার ও সম্মাননার মধ্যে রয়েছে : ড. মুহম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক (১৯৬৯), উপন্যাসে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-১৯৮০), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮১, চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৭), ফিলিপস্ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৪), ভাষা ও সাহিত্যে একুশে পদক (২০০৯, স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৮, ব্র্যাক ব্যাংক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার-২০১৮, সার্ক সাহিত্য পুরস্কার (২০১৫)। বাংলা একাডেমির বর্তমান সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন

সেলিনা হোসেন

এ কথাচিত্রীর সাথে 'ক্রিয়েটিভ বাংলা টিম' (কবির আলমগীর, সুস্মিতা আক্তার রিপা, শ্রাবনী শ্রাবণ, স্বর্ণা সাইফুল, শিবলী নোমান, আফিয়া জাহিন বৃন্ত, নিশাত তাসনিম ও ভবানি পাল) কথা বলে ৯ মে ২০২৩। শ্যামলীর বাড়িতে দীর্ঘ সময় আলাপ হয় দেশভাগ ও ছিটমহল বিষয়ে।

ভবানি পাল : দেশভাগ এ ভূখণ্ডের জন্যে একটি বিশাল ঘটনা–বলা ভালো প্রায় বহু মানুষের ভাগ্যলিপি নির্ধারিত হয়েছিল দেশভাগের মধ্য দিয়ে–দেশভাগ নিয়ে আপনার বক্তব্য শুনতে চাই।

সেলিনা হোসেন : ভারত পাকিস্তান আলাদা হলেও বাঙালি জাতি কিন্তু স্বাধীনতা পায়নি। তাদের ভাগ্য একই রকম রয়ে গেছে। তবে বাঙালির তৃষ্ণা অনেক বেশি। তারা থেমে থাকেনি, পরে নিজেদের অধিকার আদায় করতে উদ্যত ছিল। ১৯৪৮-এ আন্দোলন করেছে, ১৯৫২-তে করেছে এবং বায়ান্নোতে তো একেবারে কত ছাত্র প্রাণ দিলো!

স্বর্ণা সাইফুল : দেশভাগের ফলে এ ভূখণ্ড নিজের ভৌগোলিক সীমারেখা পেল কিন্তু অবব্যহিত পরেই ভাষা আন্দোলন বুঝিয়ে দিলো যে–দেশভাগের দ্বিজাতিতত্ত্ব এ অঞ্চলের জন্যে ভুল সিদ্ধান্ত ছিল এবং সার্বভৌম হয়ে ওঠার জন্যে লড়াই শুরু হলো যেটার চূড়ান্ত রূপ মুক্তিযুদ্ধ এ জার্নিটার মধ্যে দিয়ে আপনার শৈশব কৈশোর ও তারুণ্যের বেড়ে ওঠা–কীভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এসব ঘটনাবহুল ঘটনা ব্যক্তিজীবনে?

সেলিনা হোসেন : ভুল ছিল। দ্বিজাতিতত্ত্বের কথাটা মিথ্যা ছিল। তারা পরবর্তীতে আমাদেরকে বাঙালি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ ছিল। আমরা সংখ্যায় বেশি ছিলাম। করাচি, পেশোয়ার, সিন্ধু প্রদেশ সব জায়গার চেয়ে জনসংখ্যা ছিল পূর্ব বাংলায় বেশি। অথচ পূর্ব বাংলার মাতৃভাষাকে তারা স্বীকৃতি দিতে চায়নি, তারা দমন করার চেষ্টা করেছিল। কারণ তারা তো ক্ষমতায় ছিল। ক্ষমতায় থেকে এই জায়গাটাকে দমন করার চেষ্টা করেছে। ৪৭-এ তো আমার জন্মই। দেশভাগ আমি সচক্ষে দেখিনি। গল্প শুনেছি, চারপাশে শুনতাম ওইসব ঘটনা ঘটত। একটু একটু করে বুঝতাম তখন দেশের অবস্থা, ভাষা আন্দোলন, সংগ্রাম। এরপর যখন বড় হয়েছি তখন বই পড়ে জেনেছি। ভাষা আন্দোলনও সমসাময়িক ঘটনা। তবে আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমি নিজে দেখেছি এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমার জীবনকে প্রভাবিত করেছে।

নিশাত তাসনিম : বাংলাদেশের সাহিত্যে দেশভাগের প্রতিফলন নিয়ে আপনার মূল্যায়ন শুনতে চাই।

সেলিনা হোসেন : বাঙালি জাতির একটা বড় মর্যাদার জায়গা হিসেবে এবং গৌরবের জায়গা হিসেবে দেখি। সাহিত্য অবশ্যই দরকার আছে। পরবর্তী প্রজন্ম জানবে, পড়বে। দেশভাগের ফলে এই পূর্ববঙ্গ, তখনকার পূর্ববঙ্গ বলা হতো। পশ্চিমবঙ্গ ছিল কলকাতা এরিয়া, পূর্ববঙ্গ ছিলো এই বাংলা। তখন এই বাংলাটা এক করা হয়নি। সুতরাং আমি মনে করি আমাদের মতো করে খুব ভালো ছিলাম। ১৯৪৮-এ আমাদের প্রথম ভাষা আন্দোলন। পাকিস্তান সরকার বলেছিল, আরবি অক্ষরগুলো বাংলায় লেখা হবে। কিন্তু তবু বাংলাকে স্বীকৃতি দেয়নি। এভাবে আন্দোলন শুরু হয়। সাহিত্য এই সকল ইতিহাসের সাক্ষী।

শিবলী নোমান : দেশভাগ নিয়ে আপনার লেখা পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য–সেটাকে উদ্‌যাপন করেন?

সেলিনা হোসেন : আমি তো খুবই খুশি। নিজেকে ধন্য মনে করি। বিষয়গুলো আমাদের নতুন প্রজন্ম জানুক। এভাবে কোনো গল্পের মধ্য দিয়ে। এমনিতে তো জানবে প্রবন্ধ পড়ে বা ইতিহাসের বই পড়ে কিন্তু গল্প-উপন্যাসের মধ্যে অন্য ধরনের প্রত্যাশা থাকে। সেই জায়গাগুলোকেও ধারণ করা আমাদের প্রজন্মের জন্য দরকার।

সুস্মিতা আক্তার রিপা : দেশভাগের ফসল ছিটমহল এবং ছিটমহল নিয়ে বাংলা ভাষার একমাত্র উপন্যাস 'ভূমি ও কুসুম' সেটা আপনার লেখা। এ নিয়ে বিস্তারিত শুনতে চাই।

সেলিনা হোসেন : পত্রিকায় যখন বিভিন্নভাবে ছাপা হতো ওরা কত কষ্ট করে দিন যাপন করছে, ওরা না ভারতের না পাকিস্তানের! এই যে ওদের আলাদা করে ফেলে রাখা হয়েছে, এইটা নিয়ে তখন আমার মনে হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয় পেলে আমি সেটাকে নিয়ে চিন্তা করি। একটা লেখা লিখতে পারব। সেটাকে নিয়ে তারপরে আমি একবার চিন্তা করলাম। আমাকে নীলফামারী নিয়ে গেল ওখানকার একটা সংগঠন, এলাকার ছেলেমেয়েরা মিলে বলল, 'আপনি একটু আসেন, আমাদের সাহিত্য সংগঠন হবে আপনি একটু ওখানে থাকবেন'। আমি বললাম, অবশ্যই যাব। নীলফামারী আমি যাইনি। আমারও একটু ঘুরে আসা হবে। তারপরে যখন ওখানে গেলাম, ওদের একটা অনুষ্ঠান হলো। আমারও ভালো লাগল। তারপর ওরা বলল এইখান থেকে আমাদের বর্ডার আর ওইপাশে হলো ছিটমহল।

ওরা যখন বলল, 'চলেন একটু ছিটমহলে যাব,আপনাকে নিয়ে।'

আমি তো মহা খুশি হয়ে গেলাম! আমি যেতে যেতে বললাম–ওখানে তো সব ইন্ডিয়ান সেনারা পাহারা দেয়।

বলল যে, 'আমরা একটা গাড়ি ঠিক করব। আপনিও থাকবেন। আমরাও সাত-আট জন থাকব। দেখি ওরা কি করে!'

তারপর আমি তো একদম উৎফুল্ল! একটা নতুন জায়গা দেখব! ছিটমহল দেখব! কারণ, আমি যেগুলো বিষয় পাব, যে বিষয়গুলো লেখা হয়নি, সেগুলো নিয়ে একটা উপন্যাস করতে চাই। এরা ছিল আমার

বর্তমানে ওইটা এতটুকু জায়গা না তো অনেক বড়! তারপরে ওইপাশে একটা নদী আছে। আর ওইপাশে ইন্ডিয়ান বর্ডার আছে। তারপর গেলাম গাড়িটাসহ যেটা ছিল। আমরা সবাই মিলে গেলাম, দেখলাম তিনবিঘা করিডর! গাড়িটা ছিল বলে, অনেক বড় জায়গা তো হেঁটে হেঁটে ঘোরা যেত না! তো কোথাও কোথাও নেমে হেঁটেছি, ঘুরেছি। খুব সুন্দর। অনেক ভালো লেগেছে

সবসময়ের টার্গেট। মানে ইউনিভার্সিটি থেকে লেখা শুরু করেছি তো তখন থেকেই যখন যা মনে হতো, সেইটাকে টার্গেট করে সেই সম্পর্কে জেনে শুনে নোট করে সবকিছু নিয়ে তারপর লিখতাম।

তারপর ওরা যখন বলল, 'আমরা ওখানে যাব।'

আমি বললাম, একটা গাড়ি ভাড়া করব, করে ওখানে যাব।' আমি বললাম, ওরা (বিএসএফ) ঢুকতে দেবে? তখন বলল, 'গিয়ে দেখিই না কি হয়।' তারপরে ওখানে যাওয়ার পর গাড়ি তো যেতে দেবে না। আমরা সবাই নেমে গেছি। তখন একজন যে ছিল প্রধান (বিএসএফ)। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, আমি একটু ওখানে যাব। আমার একটা ইচ্ছা আছে আমার একটা লেখা লিখব। তো আপনি আমাকে এক মিনিট পারমিশন দেন। আমি এক মিনিট ঘুরে আসি। অনেক অনুনয় বিনয় করাতে বলল, ঠিক আছে যান। সবাইকে নিয়ে যান। দুই ঘণ্টা থাকবেন, এর বেশি থাকবেন না।

ওইটা এতটুকু জায়গা না তো অনেক বড়! তারপরে ওইপাশে একটা নদী আছে। আর ওইপাশে ইন্ডিয়ান বর্ডার আছে। তারপর গেলাম গাড়িটাসহ যেটা ছিল। আমরা সবাই মিলে গেলাম, দেখলাম তিনবিঘা করিডর! গাড়িটা ছিল বলে, অনেক বড় জায়গা তো হেঁটে হেঁটে ঘোরা যেত না! তো কোথাও কোথাও নেমে হেঁটেছি, ঘুরেছি। খুব সুন্দর। অনেক ভালো লেগেছে। তারপর তো এসে 'ভূমি ও কুসুম' লিখেছি।

আফিয়া জাহিন বৃন্ত : ছিটমহল সমস্যা মিটে গেছে, কিন্তু দীর্ঘ ৬০ বছর মানুষের যে অবর্ণনীয় কষ্ট সেটার প্রতিফলন বাংলাদেশের সাহিত্যে কতটা এসেছে?

সেলিনা হোসেন : এটা তো (ভূমি ও কুসুম) নীলফামারী ছিটমহল নিয়ে লেখা হয়েছে। আর রংপুরের সাইডে আর একটা ছিল। যেখানে ছিটমহলের শিক্ষার্থীরা রংপুর কলেজে পড়ালেখা করত কিন্তু ভারতে চাকরি হতো না! তখন ওরা বলল এটা কি করে হবে, আমরা এখানে পড়ালেখা না করলে তো ভারতে পড়ালেখা করতে পারছি না। আবার তো রংপুরে থাকি এখানেই পড়ালেখা করব। কিন্তু ওখানে সার্টিফিকেট দেখলে ওরা আমাদের আর চাকরি দেয় না।

কবির আলমগীর : 'ভূমি ও কুসুম' এত বড় ক্যানভাসের কাজ সেটাকে কখনো চলচ্চিত্র বা ওয়েবসিরিজ করার প্রস্তাব আসেনি? কেউ করেনি? এটি তো দারুণ সংলাপনির্ভর এবং চলচ্চিত্রগুণসম্পন্ন একটি টেক্সট!

সেলিনা হোসেন : না না আসেনি। 'ভূমি ও কুসুম' সম্পর্কে অনেকে বিভিন্ন সময় বলেছে কিন্তু চলচ্চিত্রের কথা কেউ বলেনি। যারা চলচ্চিত্র করে তারা বোধ হয় পড়েনি–জানে না। এতদিন পরে একজন এসেছে 'যাপিতজীবন' নিয়ে একটা সিনেমা করতে। আমি চাই আমার সাহিত্য নিয়ে কাজ হোক, তবে আমি কাউকে অনুরোধ করি না। যদি কেউ করতে চায় করবে। এখন একটা সুযোগ হয়েছে গভমেন্ট কিছু অনুদান দেয় ওখানে একটু জমা দিলে যদি কিছু পাওয়া যায় তাহলে তো করা যায়। তাছাড়া এত টাকা দিয়ে একজনের করাটা মুশকিল।

শ্রাবণী শ্রাবণ : দেশভাগ নিয়ে এখন অব্দি সবচেয়ে বড় সাহিত্যকৃতি আপনার–আপনার কি মনে হয় না, এ বিষয়ে সাহিত্যে আরও কাজ হওয়ার সুযোগ আছে?

সেলিনা হোসেন : হ্যাঁ। অবশ্যই আছে। ইয়াংদের ঐ জায়গাটা আরও আত্মস্থ করার অনেক সময় লাগবে। যারা আমার বয়সী সত্তরের উপরে বয়স হয়েছে তাদের পক্ষে সম্ভব। কারণ তারা তো সময়টাকে দেখেই বড় হয়েছে।

স্বর্ণা সাইফুল : নারী শিক্ষার ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিলো?

সেলিনা হোসেন : তৎকালীন সময়ে নারীদের নিয়ে আলাদা স্কুল কলেজ হবে ভাবাই যেত না। নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে যখন রাজশাহী মহিলা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ছাত্রী সন্ধানে শিক্ষকরা বের হন আমার আব্বাকে বলা হয়–তখন তিনিও মানা করে দেন। শিক্ষকরা যখন চলে যাচ্ছিলেন, আমি দৌড়ে গিয়ে শিক্ষকদের বলি হ্যাঁ! আপনাদের সাথে আছি, আমি সহযোগিতা করব।

সুস্মিতা আক্তার রিপা : আপনার সাহিত্যিক জীবনের পেছনে কি আপনার পরিবারের অনুপ্রেরণাই সবচেয়ে বেশি ছিলো?

সেলিনা হোসেন : ওইভাবে অনুপ্রেরণা ছিলো না, সাপোর্ট ছিল। যেমন আমি রাজশাহী থেকে পত্রিকা অফিসে লেখা পাঠাতাম। আমাকে টিফিনের জন্য যে টাকা দিত সেটা জমিয়ে রেখে খাম কিনতাম। এটা আমার আম্মা যখন জানতে পারলেন খুব বকাঝকা করেছিলেন। এরপর থেকে তারা আমাকে সাপোর্ট করতেন এইসব ব্যাপারে।

শিবলী নোমান : বর্তমান সময়ে নারীর অগ্রগতিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? কিংবা আমরা কতটা সফল হতে পেরেছি এ বিষয়ে?

সেলিনা হোসেন : এটার তো অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। তাদের তো এগিয়ে যেতেই হবে। অগ্রগতির একটা প্রচেষ্টার মধ্যে থাকতে হবে। আমরা অনেকটাই পেরেছি। যতটা প্রয়োজন। যেমন আগে রংপুরে কলেজে যারা পড়ত, তাদের ভারতে গেলে চাকরি হতো না। সার্টিফিকেটটা বাংলাদেশ দেখে নাকোচ করে দেওয়া হতো। এখন আর সেরকম করা হয় না।

আফিয়া জাহিন বৃন্ত : দেশভাগের ঘটনায় আমরা সবসময় নেতিবাচক দিকগুলোই শুনে আসছি। যেমন দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, অভাব, অনটন। কিন্তু ম্যাম এমনকি কোনো ইতিবাচক দিক নেই যার জন্য দেশভাগকে আমরা একটা আশীর্বাদও বলতে পারি?

সেলিনা হোসেন : দেশভাগের ফলে আমরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র পেলাম! এটাই তো সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ, ইতিবাচক দিক। পাকিস্তান হলো, ভারত আলাদা হলো। এরই সূত্র ধরে পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশ পেলাম। একটা সূত্র ধরে সব হয়েছে ধারাবাহিকভাবে।

ক্রিয়েটিভ বাংলা টিম : আপনাকে ধন্যবাদ আপা। দীর্ঘ সময় আপনি আমাদের দিলেন। আমরা আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং আপনার লেখক জীবন আরও উজ্জ্বল হোক।

সেলিনা হোসেন : তোমরাও ভালো করো–তোমাদের সবার কল্যাণ হোক।

কবির আলমগীর, সুস্মিতা আক্তার রিপা, শ্রাবনী শ্রাবণ, স্বর্ণা সাইফুল, শিবলী নোমান, আফিয়া জাহিন বৃন্ত, নিশাত তাসনিম ও ভবানি পাল ॥ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী

ধারাবাহিক উপন্যাস

বকেয়া হিসেব

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বকেয়া হিসেব

অজানা নম্বর থেকে বারংবার আসা ফোন তছনছ করে দেয় একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থালি। অভিনয় ও মডেলিংয়ের আগ্রহ ওঠে কাঠগড়ায়। চলে দুই বিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে চাপান উতোর তাদের কন্যার ভবিষ্যৎ গড়া নিয়েও। এক সুন্দরী বিদুষী নারীর স্বপ্ন পূরণের তাগিদে বিপদ আমন্ত্রণ, না এক ইন্টেলিজেন্স আধিকারিকের পেশা ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জটিলতা, নাকি এক নিষ্পাপ শিশুর মা-বাবার কৃতকর্মের ফল ভোগ? কিন্তু কে বকেয়া হিসেবের খাতা খুলে বসে আছে? ব্যাস্, এটুকুই সুতো ছাড়া রইল। বাকিটা নিজেরাই আবিষ্কার করুন পাঠক–কীভাবে কল্পিত খলনায়ক ও কাল্পনিক গোয়েন্দা আর অহেতুক রহস্যের অযৌক্তিক জাল ব্যতিরেকে একেবারে বাস্তব সমাজ রাজনীতি কূটনীতি থেকে তুলে আনা বিষয়, আইবি, সন্ত্রাসবাদ, ফিল্মজগতের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের রসায়ন পরতে পরতে ঘনীভূত হয়েছে। লেখিকা মনে করেন, বাস্তব হলো কল্পনার চেয়েও রহস্যময়। 'বকেয়া হিসেব' সেই রহস্যাবৃত বাস্তবকে আশ্রয় করেই।

'সোনা আমার। এখানে দুষ্টু লোক আছে। এখনই বেরোতে হবে।'

ক্যামেরার ত্রিকোণ দাড়ি ছেলেটা বিরক্ত হয়ে চেঁচালো, 'করাবেন না যখন, এখানে এসে গোলমাল পাকাচ্ছেন কেন? যান মেয়ে নিয়ে। আর কোনোদিন কল করা হবে না। নেক্সট্... বাই দ্য ওয়ে আপনি কি ডলিদির কেউ হন?'

সংযুক্তার পিঠে হাত। 'এনি প্রবলেম?' ডলি! নূপুর! সংযুক্তা ভূত দেখার মতো মেয়েকে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। রাস্তায় দেখে একটা শিয়ালদাগামী বাস। প্রচণ্ড ভিড়। তারই মধ্যে মেয়েকে ঠেলেগুঁজে তুলে নিজে পাদানিতে ঝুলে পড়লো। পুরুষ সহযাত্রীদের কেউ কেউ বিরক্ত গলায় মন্তব্য করলো, 'এত ভিড় বাসে মেয়েছেলে তাও আবার বাচ্চা নিয়ে পারে? আপনি পরের বাসে আসুন না। এভাবে ঝুলে ঝুলে কোনো লেডিস্ যায়? মেয়েটারও তো কষ্ট হবে।' 'মেয়েছেলে' শব্দটির ভুলভ্রান্তি বা অপমান নিয়ে তর্ক নয়, কাতর গলায় সংযুক্তা বললো, 'আমাকে একটু উঠে দাঁড়াতে দিন দাদা। আমাকে যেতেই হবে। আমার মেয়েটাকে কেউ কোলে বসিয়ে নিন, নয়তো কোনের দিকে ঢুকিয়ে দিন, যাতে ঠেলা না খায়।' 'মামাবাড়ির আবদার!'

ট্রেনেও উৎকট ভিড়। মেয়ের রাগ ভোলানোর সুযোগ পায়নি। কী জবাব দেবে ভেবেও পাচ্ছিল না। সোদপুরে নেমে রিক্সায় উঠে বললো, 'রাগ করে না সোনাবাবু। বাবা জয়পুর থেকে ফোন করেছিল। ওখানে গেছি জানতে পেরে খুব রাগ করছিল। ওখানে একজন বাজে মানুষকে দেখেছি। একটা বাজে লোক আমাদের ফোনে ডিসটার্ব করতো মনে নেই? বাড়ি চল। রাগ করে না। আরও ভালো কাজের অফার আসবে।'

রাতে শুতে যাওয়ার আগে চলভাষ বেজে উঠলো। আভাস আজ এত রাত করলো? ঘুম চোখেই ধরলো, 'হ্যাঁ বল। এত রাতে? ঘুমোওনি?'

'নূপুর আমি রমেশ বোলছি। নাম পাল্টে, মুখে প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে পার পাবি ভেবেছিস? তোর সব হিসাব কিতাব আমি লিখে রাখছি। নম্বর বদলে রমেশকে ফাঁকি দিবি? কখনো নূপুর, নূপুর থেকে ডলি। আর কত পালাবি?'

লাইন কেটে দিতে যাচ্ছিল সংযুক্তা। মোবাইল নম্বর পেলো কী করে শয়তানটা?

'কথা না শুনে ফোন রেখে দিলে কিন্তু খুব খারাপ হোবে।'

জাল

অনুকূল রাজবংশী আসলামের সঙ্গে এক সমঝোতায় এসেছে। টাকা তো দুজনেরই চাই। একজনের উত্তর-পূর্ব ভারতে দুর্দান্ত নেটওয়ার্ক, আর একজনের বাংলাদেশ থেকে উত্তর ভারত হয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত। নূপুরের মাধ্যমে আলাপ হলেও দুজনেই বুঝতে পারছে নূপুর ক্রমশ দুজনকেই এড়িয়ে যাচ্ছে। ভেবেছে ফিল্মে শিল্পী যোগান দিয়েই পেট চালাবে। এনজিও চালাতে নাকি মেয়েদের সত্যিকারের হাতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করার চেষ্টা চালাবে। মানে জেহাদি ও জেহাদের সেবাদাসী সংগ্রহের কাজটায় আর মন নেই? সেই সঙ্গে আড়কাঠি রোমিলার সঙ্গেও সহযোগিতা করা ছেড়ে দিয়েছে।

ছেড়ে দিতে চাইলেই কি ছেড়ে দেওয়া অত সহজ? নিজে তো মাল কম কামায়নি। এখন পুলিশের ঝামেলা এড়াতে ভালো মানুষ সাজতে চাইছে। ভেবেছে কী, অতীত রেকর্ড চিরকাল ধামাচামা দিয়ে রেখে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে যাবে? তাহলে ধর্মযুদ্ধের আদর্শের কী হবে? এতগুলো ছেলে যে ঘরবাড়ি ছেড়ে মহানযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাদের খরচ চলবে কী করে, যদি মেয়ে চালানের কাজ, অস্ত্র বেচাকেনার মধ্যস্থতা সব জায়গা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়? সরে যেতে চাইলে একেবারে সরে যেতে হবে। সব ঘাঁতঘোঁত জেনে যাওয়ার পর কারোর বেরোনোর স্বাধীনতা নেই। পুলিশে আত্মসমর্পণ করে রাজসাক্ষী হবে না কে বলতে পারে? ওদিকে ঐ শালা আইবি বহুত খচ্চড়। অনুকূলকে কম বিপদে ফেলেছে? ঐ হারামজাদা অফিসার এখন কলকাতায় পোস্টেড। জাল তো বিছিয়েছে, বাগে পেলে দেখে নেবে।

অনুকূলের ডেরাটা বাঁশের চাঁছারি ঘেরা আর মাথায় টিনের চাল দেওয়া। ত্রিপুরায় তার পাকা বাড়ি। কিন্তু নাগাল্যান্ডে থাকে এইরকম এক ঠেকজোড়া দেওয়া বাসস্থানে। একটি বছর পঁচিশের ভারি মিষ্টি দেখতে নাগা ছেলে এসে দরজায় হাঁক পাড়লো, 'ইউয়েন, ইউয়েন।'

অনুকূল কাঠের মেঝেতে ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে এসে চিনা ভাষায় ছেলেটাকে ধমক লাগালো, 'বলেছি না, আমাকে এখানে অনুকূল ছাড়া অন্য নামে ডাকবি না।'

'স্যরি ইউ– মানে অনু-খু-ল। একটা জরুরি খবর আছে।'

'আমার কাছে সব খবরই জরুরি। সিকান্দর বক্স আর্মসের টাকা অ্যাডভান্স করেছে। দেশ থেকে কনসাইনমেন্ট এলে ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডেলিভারি দিতে হবে। আসলামের নেটওয়ার্ক বড়, কিন্তু মালকড়ির ব্যাপারে সিকান্দর অনেক ফাস্ট। আমাদের কাউকেই চটালে চলবে না। আমি বর্ডারের এপারে এসে সাতখানা ইন্ডিয়ান ভাষা রপ্ত করে ফেলেছি, আর তুই এতদিনে হিন্দিটাই ঠিকমতো বলতে পারিস না। নাগাও শিখলি না।'

নূপুর এইদিক দিয়ে ওস্তাদ। ভুলেও তাকে অনুকূল বলে সম্বোধন করে না, যদিও এই নামটা ও জানে। টলিউডে অনুকূলের পরিচয় আর.এ. এজেন্সির মালিক রমেশ প্রধান হিসাবে। নূপুর খিস্তি মারার হলেও কাস্টিং ডাইরেক্টর রমেশ প্রধানকেই মারবে; বিবিধ আদর্শের বিপ্লব সমন্বয়ক, সংগঠক ও অস্ত্র সরবাহক অনুকূল রাজবংশীকে নয়।

'মাল আজ রাতেই বাম-লা দিয়ে ঢুকবে। তোমার সেই আইবি তো কলকাতায় বৌ-মেয়ে নিয়ে দিব্যি সংসার করছে।'

তাওয়াং জেলার বাম-লা এটা পরিচিত পাস। কড়া প্রহরা থাকে। তবে ভরসা একজন আছে। ইন্ডিয়ান বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের মধ্যে মিং রয়েছে পাশাং শেরপা নাম নিয়ে। মিং আরও খবর দেবে যদিও এমনিতেই পাহাড়ি পথে সাধারণ মুটে মজুররাই আমাদের মাল এপার ওপার করে দেয়। সব ব্যাটা জানেই না তারা কী বইছে; সামান্য উপরি মজুরি পেলেই খুশি। অনুকূল নিজের কাঠের পাখানা কাঠের মেঝেতে ঠুকে বললো, 'ঐ খচ্চরটাকে আমি ছাড়বো না। সব সেটিং করা ছিল। ওদের ডিপার্টমেন্ট থেকেও আমাকে রিলিজের অর্ডার দিয়ে দিয়েছিল। ওপরওয়ালার অর্ডারে ছেড়ে তো দিলো, কিন্তু আমাকে গান পয়েন্টে দাঁড় করিয়ে প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে ঝাঁপ মারতে বাধ্য করে। চারদিন যন্ত্রণায় কাৎরানোর পর কয়েকজন মণিপুরী মেয়ে আমাকে দেখে এগিয়ে আসে। ওদের কাছে নিজেকে ত্রিপুরার বাঙালি পরিচয় দিয়ে পটিয়ে পাটিয়ে ত্রিপুরায় গিয়ে শেল্টার পাই। কিন্তু শিনবোন ভেঙে তিন টুকরো, স্পাইনেও পার্মানেন্ট ইনজুরি, তার চিকিৎসা কি মণিপুরের গ্রামে বসে হয়? নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়ায় সবকটা স্টেটই ইন্ডিয়ান আর্মির ওপর হাড়ে চটা। স্পেশালি আসাম রাইফেলস্ তো ত্রাস। সেই ঘৃণাতেই হাওয়া দিয়ে আমি এদের আপন হয়েছি। কিন্তু আমার একটা পা চিরদিনের মতো চলে গেল। আমার ক্যামেরাটা অবশ্য ঝোপে পড়ায় বাঁচাতে পেরেছিলাম। কিন্তু ছবিগুলো চায়নায় যতদিনে পাঠালাম ততদিনে সেগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল।'

'ঐ অফিসারের বৌ বাচ্চাকে টার্গেট করবো?'

'একদম না। মানে এই মুহূর্তে তো নয়ই। একশোটা কমন পিপলকে মারলে যতটা খবর হয়, তদন্ত কি ধর-পাকড় হয় তার চেয়ে অনেক কম। শতশত মানুষ মেরেও বিচারের রায় বেরোতে বেরোতে দাউদ ইব্রাহিমরা দুবাইয়ে সাত পুরুষের সম্পত্তি কামিয়ে নেয়। কিন্তু একজন আইবি অফিসারকে কি তার ফ্যামিলিকে মারলে ডিপার্টমেন্ট চুপ করে বসে থাকবে না।'

'কিন্তু তোমার কাছেই তো শুনেছি, লোকটা ডিপার্টমেন্টে পপুলার নয়। বেশি কাজ দেখাতে গিয়ে ওপরওয়ালাদের চটিয়েছিল। কলকাতায় পোস্টিং সুখে ঘর করতে দেওয়ার জন্য নয়, সেন্সিটিভ জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য।'

'বরাবর কি একই ওপরওয়ালা থাকে শূয়োর? তাদেরও তো বদলি হয়, শাফলিং হয়। ওকে দাওয়াই যা দেওয়ার আমিই দিচ্ছি। আমার তো পুরোনো হিসাব রয়েছে। যা তোকে আর অত ভাবতে হবে না।'

বৌ মেয়ে কলকাতায় রেখে নাগাল্যান্ড আসবে। ব্যাটার রাতের ঘুম উড়ে গেছে। ভাবছে ল্যান্ডলাইন কেটে দিয়ে রমেশ প্রধানকে এড়ানো গেছে। কিন্তু অনুকূলের ফেউ? আর নূপুরের ভূত?

ঐ হারামির বৌটাকে নূপুরের মতো দেখতে। কী কপাল! ওকে দেখেই ঠিক করেছিল অনুকূল ওরফে ইউয়েন, কাজে লাগাতে হবে। সমস্ত পরিকল্পনাটা কষতে প্রাথমিকভাবে সময় লেগেছে দিন সাতেক। তবে পরিস্থিতির সঙ্গে পরিকল্পনা বারবার বদলাতে হয়। নূপুরের তো আর এই পৃথিবীতে থাকার কোনো দরকার নেই। তার বদলে ঐ মেয়েটাকেই সমস্ত গলদ কামের প্রমাণসহ নূপুর বানিয়ে ফাঁসাতে হবে। হয়তো কোনোদিন নির্দোষ প্রমাণিত হবে, কিন্তু ততদিনে পরিবারটা বরবাদ হয়ে যাবে। কিন্তু নূপুর নেই এটা জানাজানি হয়ে গেলেও বিপদ। শালীর হেভি কানেকশন। ও নেই জানলে ওর নেটওয়ার্কটা কাজ করা বন্ধ করে দেবে। সিনেমায় আর্টিস্ট সাপ্লাইয়ের আবডালে জেহাদি সাপ্লাইয়ের নেটওয়ার্কটা জোর চোট পাবে। এমনকি রোমিলাও রিভোল্ট করতে পারে, যদিও রোমিলার মেয়ে পাচারের ব্যবসাও নূপুরের জন্য ধাক্কা খাচ্ছে। তবু এত বছর রমেশের সঙ্গে কাজ করার পরিণতি এই দেখলে রোমিলা ভড়কে যাবে না? সুতরাং নূপুরের আপাতত মরলেও চলবে না।

আসলামও নূপুরের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। নিক। যেমন খুশি করে নিক। কিন্তু ওকে বোঝাতে হবে নূপুরকে মারলেও ওর একটা ডামি কিছুদিনের জন্য সাজিয়ে রাখা দরকার, যাকে বা যার মেয়েকে ছুরির ফলায় বোবা করে রেখে নূপুরের ডান হাত সালমা অনুকূলদের নির্দেশ মতো

রোমিলাদের সঙ্গে কারবার চালিয়ে যাবে। ডামি নূপুরকে শুধু সামান্য কিছুদিন সেজেগুজে আসলের প্রক্সি দিতে হবে। বাচ্চাটাকে তুলে আনতে পারলে মাকে কব্জা করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ওদিকে আইবি-র বাচ্চা বাপটা তো, আহ্! ভাবলেই দারুণ তৃপ্তির অনুভূতি হচ্ছে। বৌ-বাচ্চার দাম একটা পায়ের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশি।

ওদিকে নূপুরের লুকোচুরিতে রোমিলা আরও একটু বিরক্ত হবে। তারপর নকল নূপুর এবং পারলে তার ছানাও কোনো দুর্ঘটনায় মারা যাবে, যার সাথে অনুকূল বা আসলামদের কোনো যোগ থাকবে না। ঐ আভাস আচার্য্যের ওপরও খেলিয়ে খেলিয়ে বদলা নেওয়া যাবে, আর রোমিলাও নূপুর বা ডলির আকস্মিক মৃত্যুতে অনুকূলদের ওপর বিশ্বাস হারাবে না। এত কথা মাথামোটা চ্যাংকে বোঝানো যাবে না। সে নিজের এখানকার মাইকেল ডাগা পরিচয়টা মনে রেখে অস্ত্রের সরবরাহটুকু সামলাক।

চ্যাং চলে যেতে মোবাইল বার করে ডায়াল করলো অনুকূল। 'হ্যালো, রোমিলা ম্যাডাম। কেমন আছেন আপনি? সোব খোবর ঠিকঠাক তো?' রমেশ প্রধান সাজতে গিয়ে অবাঙালি টানে বাংলা বলাটাও রপ্ত করেছে ইউয়ান ওরফে অনুকূল।

'আরে রমেশজী। অনেক দিন বাঁচবেন। আপনার কথাই ভাবছিলাম। ঠিকঠাক তো সব খবর?'

'হাঁ ঠিকই বোলা যায়। আপনার এক্সপোর্টের কারোবার কেমন চলছে? নূপুর ঠিকমতো কোঅপারেট করছে তো?'

'ভালো কথা। আপনার নূপুর আজকাল নিজেকে কী ভাবে কী? এনজিও চালায় বলে ওর কাজটা কাজ, নাকি আদর্শের জন্য? আর আমারটা নয়? ও এদেশে মানুষ সাপ্লাই করে, আমি বিদেশে মানুষ এক্সপোর্ট করি। আমার ধান্দার সাপোর্ট না থাকলে ওর অর্গানাইজেশন চলতো, মানে আপনার অর্গানাইজেশন ও চালাতে পারতো?'

'নূপুর খুব এফিশিয়েন্ট মেয়ে। হামার অর্গানাইজেশন কী পিলার বোলা যায়। ও তো আপনার ফ্রেন্ড আছে। নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নিন।'

'জানেন আজকাল ও নিজে কথা বলে না। সালমাকে পাঠায়। আমিও বাধ্য হয়ে নিজে কথা না বলে দিলারাকে এগিয়ে দেব। আমাকে বেশ্যার দালাল মনে করে? নিজে কী? কচি ছেলেমেয়েদের ফুসলিয়ে– ইয়ে মানে...'

'না না। একদম ঝোগড়া নয়। নূপুরকে হামি সমঝাবো। ও খুব ভালো সোব হ্যান্ডেল করে। অউর আপ সালমাকে সাথ হী বাত কোর না। আরও টুকটাক কথার পর 'আপসমে দোস্তি বরকরার রক্‌খিয়ে। বাই।' বলে অনুকূল ফোন রাখলো।

এ তো মেঘ না চাইতে জল। রোমিলাকে নূপুরের বিপক্ষে নিয়ে যেতে বিশেষ কিছু করতে হবে না, কায়দা করে আর একটু তাতালেই চলবে, যাতে ও নূপুরের বদলে সালমার সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু ডলি বা নূপুরের এখনই হারিয়ে যাওয়া চলবে না। তাতে রোমিলাও পেতে পারে, আর ঐ আইবির বাচ্চাটাকেও টাইট দেওয়া যাবে না।

রোমিলা যদিও রমেশ প্রধানের টেলিভিশন আর ফিল্ম দুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এনজিওর আবডালে জেহাদি যোগাযোগের কথা জানে, কিন্তু রমেশ প্রধান যে আসলে ত্রিপুরার বাঙালি অনুকূল রাজবংশী এই পরিচয়টা জানে না। সবাইকে সবকিছু জানাতে নেই। বেইমানির উদ্দেশ্য না থাকলেও মুখ দিয়ে বেফাঁস কথা বেরিয়ে যেতে কতক্ষণ? নূপুর হয়তো বেশি জানে; কিন্তু সেও তো জানে না রমেশ প্রধান ওরফে অনুকূল রাজবংশীর আসল নাম ইউয়েন জেং।

পরের ফোনটা করলো আসলামকে।

নিখোঁজ

নূপুর মাস খানেক হলো নিখোঁজ। শোনা যাচ্ছে সে এতদিন রমেশ ভাইয়ের সঙ্গে বেইমানি করে ডাবল এজেন্টের কাজ করে এসেছে। সে আসলে একজন ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর আধিকারিকের স্ত্রী। ব্যাপারটা কেউ টের পায়নি! রমেশ টের পেতে সোজা ছদ্মবেশ পাল্টে সে শুধু সরকারি অফিসারের বৌ হয়ে ঘরকন্না করছে। আইবির বৌ বলে সরকারি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকবে ভেবেছে হয়তো। রমেশ ভাইয়ের অনেক টাকাও মেরে দিয়ে ভেগেছে। রমেশ ফোন করলে ভান করছে নূপুর নামে জন্মে কাউকে চেনে না। পরিচয়টা অস্বীকার করছে, সে তো করবেই। এতদিন ল্যান্ডলাইনে ধরা যাচ্ছিল, সেই লাইনও কেটে দিয়েছে। কিন্তু তার মোবাইল নাম্বার যোগাড় করে পাকড়াও করা গেছে। ঐসব নাম্বার-টাম্বার বদলে কি পালানো যায় বেশিদিন?

টাকা তো রোমিলাও পায় নূপুরের কাছ থেকে। শালী, এত বড় গিরগিটি কে জানতো? মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে চারজন মেয়েকে সাপ্লাই দেবে বলে রোমিলার কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে ভোঁ ভাঁ। রোমিলার আরও সাপ্লাই লাইন আছে। কিন্তু রমেশ প্রধানের সূত্রে গত পাঁচ বছর ধরে নূপুর বা ডলিও নিজের সংগঠন থেকে ছাঁটাই করা মেয়েদের যোগান দিয়ে গেছে রোমিলার কাছে। এর জন্য মোটা টাকা পায় নূপুর। রোমিলাকে মেয়েমানুষের আড়কাঠি বলে নিজে লোকের টাকা মেরে এখন সতীপনা দেখানো হচ্ছে? ধান্দাতে বিশ্বাসটাই শেষ কথা। লিখিত পড়িত ব্যবসায় যতটা বিশ্বস্ততা লাগে, এইসব বেআইনি কারবারে তার চেয়ে লাগে অনেক বেশি; কারণ কেউ চুক্তিপত্র সই করে না, চুক্তিভঙ্গ হলেও আদালতে যাওয়া যায় না মীমাংসার জন্য। তখন আসলাম ভাইদের ডাক পড়ে হিসাব বরাবর করার জন্য। তোর যোগ্য শাস্তি হোক শয়তানি!

কেষ্টপুর খালের জলে মাছ ধরতে গিয়ে একজনের বঁড়শিতে গেঁথে যায় একটা বস্তা। টান মারলে বস্তাটা উঠে আসে। খুলে দেখা যায় এক মহিলার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। তাই নিয়ে পুলিস একটু নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়েছিল স্থানীয় জনতার চাপে। ফরেন্সিক রিপোর্ট বলছে মারার আগে প্রচণ্ড অত্যাচার করা হয়েছিল, তবে যৌন নির্যাতনের কথা এখনো শোনা যায়নি। হয়ে থাকলেও এমন তো কতই হয়। একটা উল্কি আছে পিঠে যা থেকে অনুমান করা যায়, মহিলার নাম ডলি। সারা গা পচে গেছে। ঐ উল্কির অংশটা কীভাবে এখনো আবছা বোঝা যাচ্ছে কে জানে? কিন্তু বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। তার আত্মীয়স্বজন বা ঘনিষ্ঠ কারও খোঁজও পাওয়া যায়নি। সম্ভবত দেহের সঙ্গে বস্তায় পাথর ভরে পঁচিশ ত্রিশদিন আগে ফেলা হয়েছিল।

খবরটা ছোট করে বেরিয়েছে কয়েকটা কাগজে। কাগজের প্রথম পাতার খবর উড়িষ্যার এক মন্দিরে শতাধিক ভক্ত গুজবে হুড়োহুড়ি করে পদপিষ্ট হয়ে মৃত বা গুরুতর আহত। ভেতরের পাতা থেকে রোমিলাকে সংবাদটা দেখালো দিলারা। রোমিলার কপালে ভাঁজ। এই সময় থেকেই তো নূপুরও নিখোঁজ। আর নূপুরের আর এক নাম যে ডলি এ তো সবাই জানে। •

চলবে...

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ মেদিনীপুর। পৈতৃক বসবাসসূত্রে শেকড় পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার ডিশেরগড় খনি অঞ্চলে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (রসায়ন), বিএড, এমবিএ'র পর কর্মজীবন শুরু করেন ফার্মাসিউটিকল কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে। বর্তমানে একাধিক বাণিজ্যিক-অবাণিজ্যিক পত্রপত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটদের গল্প, ছড়া, ফিচার, বই বা নাটক পর্যালোচনা ইত্যাদি রচনায় নিয়োজিত। পেশাদারিভাবে ইংরেজি কনটেন্টও লিখেছেন অসংখ্য। কবিতা দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও শ্রীপর্ণার গদ্যসৃষ্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও ফিচারগুলো তাঁর মননের অন্যতম পরিচয়। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও অনুবাদের জন্য পেয়েছেন বঙ্গ সংস্কৃতি পুরস্কার, ঋতবাক পুরস্কার, শর্মিলা ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার, ঊষা ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, নবপ্রভাত রজত জয়ন্তী বর্ষ স্মারক সম্মান, প্রতিলিপি বিশেষ পুরস্কার, রাজেশ সরকার স্মৃতি পুরস্কার, পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (মেঘদূত সাহিত্য পত্রিকা–সেরার সেরা সম্মান), ডলি মিদ্যা স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, স্মৃতি ও চেতনা পুরস্কার, People Reflections Special Recognition, সোনালি ঘোষাল পুরস্কার (অনুবাদ) ইত্যাদির মতো নানা পুরস্কার।

RAJASTHAN MAP

একনজরে রাজস্থান	
দেশ	ভারত
অঞ্চল	ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল
রাজধানী	জয়পুর
জেলা	৩৩টি
প্রতিষ্ঠা	১ নভেম্বর ১৯৫৬
সরকার	
• রাজ্যপাল	কলরাজ মিশ্র
• মুখ্যমন্ত্রী	অশোক গেহলাট
• আইনসভা	এককক্ষ বিশিষ্ট (২০০টি আসন)
• সংসদীয় আসন	২৫ লোকসভা
• হাইকোর্ট	রাজস্থান হাইকোর্ট
আয়তন	
• মোট	৩,৪২,২৩৯ বর্গকিমি (১,৩২,১৩৯ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	১ম
জনসংখ্যা (২০১৫)	
• মোট	৭,৩৫,২৯,৩২৫
• ক্রম	৮ম
• ঘনত্ব	৫৫০/কি.মি ২ (১,৪০০/বর্গমাইল)
• সাক্ষরতা	৬৭% (৩৫তম)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও	৩১৬৬ কোড IN-RJ
সরকারি ভাষা	হিন্দি
ওয়েবসাইট	www.rajasthan.gov.in

কলরাজ মিশ্র
রাজ্যপাল

অশোক গেহলাট
মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রবিন্দু

রাজপুতানার রাজস্থান

রোদ্দুর চয়ন

‘রাজস্থান’ শব্দের অর্থ–‘Land Of Kings’ অর্থাৎ ‘রাজার ভূমি’। এটি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। আয়তনের দিক থেকে ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য। মরুভূমিতে ঘেরা এই জায়গায় বহু বছর আগে রাজপুতরা বসবাস করত। যার জন্য এই এলাকার নাম ছিল ‘রাজপুতানা’। যেটি পরবর্তীতে পরিবর্তন করে ‘রাজস্থান’ রাখা হয়েছে

ভৌগোলিক অবস্থান

২৩.৩ থেকে ৩০.১২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৯.৩০ থেকে ৭৮.১৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ; কর্কট ক্রান্তীয় অঞ্চলটি এর দক্ষিণতম প্রান্ত দিয়ে গেছে। এর পশ্চিমে পাকিস্তান, দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাট, দক্ষিণ-পূর্বে মধ্যপ্রদেশ, উত্তর-পূর্বে উত্তর প্রদেশ, উত্তরে হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব অবস্থিত। এটি ২৭.০২৩৮° উত্তর এবং ৭৪.২১৭৯° পূর্বে অবস্থিত।

রাজ্যটি আনুমানিক ৩৪২,২৩৯ বর্গকিলোমিটার (১৩২,১৩৯ বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম রাজ্য। রাজস্থান ভারতের মোট ভৌগোলিক এলাকার ১০.৪ শতাংশ।

জনসংখ্যা

আয়তনের দিক থেকে রাজস্থান ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য হলেও জনসংখ্যার দিক থেকে এটি ৭ম স্থানে আছে। ২০২৩ সালে এটির জনসংখ্যা প্রায় ৭৯,৫০২,৪৭৭। যার মধ্যে পুরুষ ৪১,৩২৫,৭২৫ এবং মহিলা ৩৮,২৬৬,৭৫৩। প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ২০০ জন বসবাস করে। রাজ্যটিতে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৫.৬৬% বাস করে।

স্থানীয় রাজস্থানী জনগণ রাজ্যের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। রাজস্থান রাজ্যটিও সিন্ধিদের দ্বারা জনবহুল, যারা ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিচ্ছেদের সময় সিন্ধু প্রদেশ (বর্তমানে পাকিস্তানে) থেকে রাজস্থানে এসেছিলেন।

ধর্মাবলম্বীর বিচারে এ রাজ্যের শতকরা জনগোষ্ঠীর একটি পরিসংখ্যান- হিন্দুধর্ম (৮৮.৪৯%), ইসলাম (৯.০৭%), খ্রিস্টধর্ম (০.১৪%), শিখধর্ম (১.২৭%), বৌদ্ধধর্ম (০.০২%), জৈনধর্ম (০.৯১%), অজ্ঞাত (০.১০%) অন্যান্য (০.০১%)

জলবায়ু

রাজস্থান চরম জলবায়ু পরিস্থিতির শিকার হয়। এটিই ভারতের সবচেয়ে শুষ্ক রাজ্য। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা প্রায়ই ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠে যায়। সারাদিনে তাপমাত্রা উচ্চ হয় এবং রাতে তাপমাত্রা পর্যাপ্তভাবে কমে যায়। বছরের বেশিরভাগ সময় এ রাজ্য শুষ্ক হওয়ার কারণে, এ রাজ্যে গ্রামের বাসিন্দাদের জলের জন্য কয়েক কিলোমিটার হেঁটে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যেতে হয়। এই অঞ্চলে বর্ষা জুলাই মাসে শুরু হয় এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তখন তাপমাত্রা ২১-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের (৬৯.৪-৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট) মধ্যে থাকে। এ রাজ্যে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম হয়, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৩-১৭২ মিলিমিটার প্রায়। রাজস্থানে শীতকাল অক্টোবরে শুরু হয় এবং মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। শীতকালে রাজস্থানে তাপমাত্রা ১০-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের (৫০-৮০.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট) মধ্যে থাকে।

ভাষা

রাজস্থানের সরকারি ভাষা হিন্দি আর ইংরেজি হলো অতিরিক্ত সরকারি ভাষা। কিন্তু এ রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ 'মারোয়ারি' ভাষায় কথা বলে। এছাড়াও ধুন্ধারি, হারাউতি, ব্রজ ইত্যাদি ভাষা এখানে প্রচলিত।

শিক্ষা

রাজস্থানের শিক্ষার হার খুবই কম, মাত্র ৬৬.১১% , অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ২৮তম। যার মধ্যে পুরুষ ৭৯.১৯% এবং মহিলা ৫২.১২%। রাজ্যের স্কুলগুলি সরকার বা ব্যক্তিগত ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। বেশিরভাগ স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম মূলত হিন্দি বা ইংরেজি।

স্বাস্থ্য

২০২২-২৩ অর্থ বছরে রাজস্থানের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য বাজেট ২০,১১১ কোটি রুপি, সামগ্রিক বাজেটের ৭.৪%। বর্তমানে এই রাজ্যে ৩৫টি জেলা হাসপাতাল, ৫টি স্যাটেলাইট হাসপাতাল, ১৬টি মহকুমা হাসপাতাল, ৫৫১টি কমিউনিটি হেলথ সেন্টার, ২০৬৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১৩২২৭টি উপকেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও সরকার প্রাইভেট স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে।

পর্যটন

রাজস্থান ভারতের একটি জনপ্রিয় পর্যটন স্থান যা তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক স্থান, রাজকীয় দুর্গ এবং প্রাসাদ, প্রাণবন্ত উৎসব, স্থানীয় খাবার এবং মরুভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য পরিচিত।

যে আকর্ষণে রাজস্থানের পর্যটন শিল্প এত সমৃদ্ধ তা এখানে উল্লেখ করছি–

ঐতিহাসিক দুর্গ এবং প্রাসাদ : রাজস্থানে বেশ কয়েকটি বৃহৎ দুর্গ এবং প্রাসাদ রয়েছে যা এই অঞ্চলের রাজকীয় ইতিহাস প্রদর্শন করে। উল্লেখযোগ্য আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে–জয়পুরের অ্যাম্বার ফোর্ট এবং সিটি প্যালেস, যোধপুরের মেহরানগড় ফোর্ট, বিকানেরের জুনাগড় ফোর্ট এবং যোধপুরের উমেদ ভবন প্রাসাদ। সোনালি বেলেপাথরের চিত্তাকর্ষক স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত জয়সালমির দুর্গ যা 'সোনার দুর্গ' নামেও পরিচিত। দুর্গ কমপ্লেক্সে প্রাসাদ, মন্দির এবং হাভেলি (ঐতিহ্যবাহী প্রাসাদ) রয়েছে।

মরুভূমির অভিজ্ঞতা : রাজস্থানের থর মরুভূমি পর্যটকদের জন্য একটি অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করে। বালির টিলা ভেদ করে উট সাফারি, মন্ত্রমুগ্ধকর সূর্যাস্ত এবং মরুভূমির শিবিরে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার সাথে রাত কাটানো–পর্যটকদের আকর্ষণীয় উপাদান। মরুভূমি এবং স্যাম স্যান্ড টিউনস এবং জয়সালমির ফোর্টের মতো আকর্ষণগুলি অন্বেষণ করার জন্য জয়সালমির একটি জনপ্রিয় শহর।

বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং জাতীয় উদ্যান : বাঘের সংখ্যার জন্য বিখ্যাত রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যান, কেওলাদের জাতীয় উদ্যান (ভরতপুর পাখি অভয়ারণ্য), সারিস্কা টাইগার রিজার্ভ, কোটার মুকুন্দা হিলস টাইগার রিজার্ভ, মাউন্ট আবু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, তালছাপার অভয়ারণ্য এবং মরুভূমি জাতীয় উদ্যান উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র।

হেরিটেজ শহরগুলি : 'পিঙ্ক সিটি' জয়পুর, 'লেকের শহর' উদয়পুর এবং 'নীল শহর' যোধপুরে রয়েছে বিভিন্ন দুর্গ, প্রাসাদ, জাদুঘর, হ্রদ, মন্দির ইত্যাদি যা অবশ্যই দর্শনীয় স্থান। এছাড়া কালিবঙ্গন এবং বালাথালে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য : হিল স্টেশন, প্রাচীন আরাবল্লী পর্বতশ্রেণি ইত্যাদির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

হস্তশিল্প এবং কেনাকাটা : রাজস্থান টেক্সটাইল, মৃৎশিল্প, গয়না এবং চামড়াজাত সামগ্রীসহ ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

প্রসিদ্ধ ধর্মীয় স্থান : পুষ্কর হলো একটি পবিত্র শহর যা এর পবিত্র পুষ্কর হ্রদ এবং ব্রহ্মা মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

আজমির হলো একটি তীর্থস্থান যা শ্রদ্ধেয় আজমীর শরীফ দরগাহ, সুফি সাধক খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির সমাধির জন্য পরিচিত।

রসনাবিলাস : রাজস্থানের খাবার তার সমৃদ্ধ স্বাদ এবং অনন্য রন্ধনপ্রণালীর জন্য পরিচিত। ডালবাতি চুরমা, গাত্তে কি সবজি, লাল মাস এবং পিয়াজ কাচোরি হলো কিছু জনপ্রিয় রাজস্থানী খাবার।

উৎসব : রাজস্থানের কয়েকটি উৎসব হলো–উদয়পুরের মেওয়ার উৎসব, পুষ্কর উট মেলা, জয়পুরের সাহিত্য উৎসব, তিজ উৎসব এবং গঙ্গাউর উৎসব, যোধপুরের মরু উৎসব, ভরতপুরের ব্রিজ হোলি, আলওয়ারের মৎস্য উৎসব, যোধপুরের ঘুড়ি উৎসব, বিকানেরের কোলায়ত মেলা ইত্যাদি।

পর্যটন পরিকাঠামো : হোটেল, গেস্টহাউস এবং বিভিন্ন বাজেটের রিসোর্ট রাজ্যজুড়ে পাওয়া যায়। ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার এবং ট্রাভেল এজেন্সি দর্শকদের ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে।

যোগাযোগ ও পরিবহন

রাজস্থানে বিস্তৃত যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে যা বাসিন্দাদের এবং পর্যটকদের রাজ্যের মধ্যে সুবিধাজনকভাবে ভ্রমণ করতে এবং ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য অংশের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সহায়ক।

জয়পুরের জয়পুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (JAI), রাজ্যের বৃহত্তম, ব্যস্ততম এবং একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এছাড়াও যোধপুর, উদয়পুর, আজমীর, বিকানের এবং জয়সলমিরে বেসামরিক বিমানবন্দর রয়েছে।

রাজ্যে রেলপথের দৈর্ঘ্য সমগ্র ভারতের রুটের দৈর্ঘ্যের ৮.৬৬ শতাংশ। জয়পুর জংশন হলো উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের সদর দপ্তর। জয়পুর, আজমির, বিকানের রাজ্যের ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন। কোটা হলো একমাত্র বিদ্যুতায়িত বিভাগ যা তিনটি রাজধানী এক্সপ্রেস এবং ট্রেন দ্বারা ভারতের সমস্ত বড় শহরে পরিসেবা করা হয়। জয়পুর মেট্রো হলো জয়পুর শহরের মেট্রো রেল ব্যবস্থা। এটি রাজস্থানের একমাত্র মেট্রো রেল ব্যবস্থা এবং এটি ৩ জুন ২০১৫ সাল থেকে চালু হয়েছে। এটি ভারতের প্রথম মেট্রো যা ট্রিপল-তলা এলিভেটেড রোড এবং মেট্রো ট্র্যাকে চলে। রাজস্থানে প্যালেস অন হুইলস এবং রয়্যাল রাজস্থান অন হুইলসের মতো বিলাসবহুল ট্রেন রয়েছে, যা পর্যটকদের জন্য একটি অনন্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

রাজ্যটি একটি উল্লেখযোগ্য সড়ক নেটওয়ার্ক দ্বারা পরিবেশিত হয়, যা শহুরে কেন্দ্র, কৃষি বাজার-স্থান এবং গ্রামীণ এলাকার মধ্যে সংযোগ প্রদান করে। রাজ্যে ৩৩টি জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে, যার মোট দূরত্ব ১০,০০৪.১৪ কিমি। রাজ্যের মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ২৬৯,০২৮ কিমি। স্থানীয়ভাবে ভ্রমণের জন্য রাজ্যে ট্যাক্সি, অটো রিকশা এবং সাইকেল রিকশা সহজভাবে পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্টেট গণপরিবহন সংস্থা এবং বেঞ্চমার্ট সার্ভিস রাজস্থানের বিভিন্ন শহরের মধ্যে নিয়মিত বাস পরিষেবা প্রদান করে।

যোগাযোগ পরিকাঠামো রাজস্থানের প্রধান শহরগুলিতে ল্যান্ডলাইন এবং মোবাইল টেলিফোন পরিষেবাগুলির পাশাপাশি উচ্চ-গতির ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করে মোবাইল নেটওয়ার্ক রাজ্যের বেশিরভাগ অংশকে যুক্ত করে। উপরন্তু, ইন্টারনেট ক্যাফে এবং ওয়াই-ফাই পরিষেবা শহরাঞ্চলে রয়েছে।

খেলাধুলা

রাজস্থান খেলাধুলার জন্য খুবই পরিচিত। এখানকার খেলাধুলা প্রধানত স্থানীয় লোকজ এবং ঐতিহ্যগত পরিবেশের উপর ভিত্তি করে। রাজস্থানের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী এবং জনপ্রিয় খেলা রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য পশ্চিমীয় খেলাগুলি যেমন ফুটবল, হকি, টেনিস ইত্যাদি রাজস্থানের নগর এলাকায় খেলা হয়। রাজস্থানে খেলা হয় এমন কয়েকটি খেলা হলো : ক্রিকেট, গুলি দাণ্ডা, কাবাডি, কুস্তি, উট দৌড়, পোলো, তীরন্দাজ ইত্যাদি।

সংস্কৃতি

রাজস্থানের একটি সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত সংস্কৃতি রয়েছে যা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গভীরে নিহিত। রাজ্যটি তার রঙিন উৎসব, লোকসংগীত এবং নৃত্যের ফর্ম, জটিল শিল্পকর্ম, রাজকীয় স্থাপত্য এবং উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য পরিচিত। এখানে রাজস্থানের সংস্কৃতির কিছু মূল দিক তুলে ধরছি–

উৎসব : সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো পুষ্কর উটমেলা। প্রতিবছর এটি পুষ্কর শহরে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য প্রধান উৎসবগুলির মধ্যে রয়েছে দীপাবলি, হোলি, গঙ্গাউর, জয়পুর সাহিত্য উৎসব, তিজ, হাতি উৎসব, মাড়োয়ার উৎসব, মরুভূমি উৎসব, মকরসংক্রান্তি এবং রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্টিভ্যাল (RIFF) যেগুলি অত্যন্ত উৎসাহ এবং ঐতিহ্যগত উৎসবের সাথে উদযাপিত হয়।

লোকসংগীত এবং নৃত্য : রাজস্থান তার প্রাণবন্ত লোকসঙ্গীত এবং নৃত্য ফর্মের জন্য বিখ্যাত। ঢোল, হারমোনিয়াম, সারঙ্গী, মোর্চাং (ইহুদির বীণা) ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী যন্ত্র ব্যবহৃত হয় এদের লোকসঙ্গীত এবং নৃত্যে। রাজ্যে বিভিন্ন লোকনৃত্যের ধরন রয়েছে–যেমন ঘূমার, কালবেলিয়া, চারি এবং ভাওয়াই যেগুলি উৎসব এবং বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। এছাড়াও রাজস্থানি লোকসংগীত, কাঠপুতলি, ভোপা, চাং, তেরতালি, ঘিন্দ, গাইর নৃত্য, কাচ্চি ঘোরি এবং তেজাজি ঐতিহ্যবাহী রাজস্থানী সংস্কৃতির উদাহরণ।

শিল্প ও কারুশিল্প : রাজস্থান তার চমৎকার এবং বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙের শিল্পকর্ম এবং কারুশিল্পের জন্য বিখ্যাত। রাজ্যটি তার ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রগুলির জন্য পরিচিত, যা মহাকাব্য, রাজদরবার এবং লোককাহিনির দৃশ্যগুলিকে চিত্রিত করে। রাজধানী শহর জয়পুর তার রত্নপাথর এবং আধা-মূল্যবান পাথরের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। এছাড়াও অন্যান্য শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে–কালাকৃতি, মার্বেল শিল্প, বেলমেকে শিল্প, টেরাকোটা, গয়না তৈরি শিল্প ইত্যাদি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে হস্তশিল্প উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান প্রদান করে।

স্থাপত্য : রাজস্থানে চমৎকার দুর্গ, প্রাসাদ এবং হাভেলি (প্রাসাদ) রয়েছে যা এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ স্থাপত্য ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো জয়পুরের আম্বার ফোর্ট, যোধপুরের মেহরানগড় ফোর্ট এবং যোধপুরের উমেদ ভবন প্রাসাদ। এই স্থাপত্যের বিস্ময়গুলিতে জটিল খোদাই, প্রাণবন্ত ফ্রেস্কো এবং বিশাল উঠোন রয়েছে।

পোশাক : ঐতিহ্যবাহী রাজস্থানী পোশাক এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

ঘটনাপঞ্জি ❖ জুন

০১ জুন ১৮১৪ ❖ কলকাতায় ভারতীয় সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠা
০৩ জুন ১৯৪৩ ❖ দক্ষিণী সুরকার ইলাইয়া রাজার জন্ম
০৫ জুন ১৯৬১ ❖ টেনিস তারকা রমেশ কৃষ্ণণের জন্ম
০৯ জুন ১৯০০ ❖ সাঁওতাল নেতা বিরসা মুণ্ডার মৃত্যু
১১ জুন ১৯০১ ❖ প্রমথনাথ বিশীর জন্ম
১৬ জুন ১৯২৫ ❖ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু
১৬ জুন ১৯৪৪ ❖ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মৃত্যু
১৬ জুন ১৯৪৭ ❖ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর জন্ম
২০ জুন ১৯২৩ ❖ 'রূপদর্শী' গৌরকিশোর ঘোষের জন্ম
২২ জুন ১৯১২ ❖ সাগরময় ঘোষের জন্ম
২৫ জুন ১৯২২ ❖ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু
২৫ জুন ১৯৪১ ❖ গুরুসদয় দত্তের মৃত্যু
২৬ জুন ১৮৩৮ ❖ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৯ জুন ১৮৬৪ ❖ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
২৯ জুন ১৮৭৩ ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু
২৯ জুন ১৯৩৮ ❖ বুদ্ধদেব গুহর জন্ম

ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। মহিলারা প্রায়শই রঙিন এবং অলংকৃত পোশাক পরেন। যেমন লেহেঙ্গা (লম্বা স্কার্ট), ওধনি (ওড়না) এবং চোলিস (ব্লাউজ)। পুরুষরা সাধারণত পাগড়ি (সাফা), ধুতি (ঢিলেঢালা ট্রাউজার) এবং আঙ্গারখা (লম্বা কোট) পরে। রাজস্থানী পোশাকে প্রচুর আয়নার কাজ এবং সূচিকর্ম রয়েছে। মাথা ঢেকে রাখার জন্য কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করা হয়। যা তাপ থেকে সুরক্ষা এবং শালীনতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। রাজস্থানী পোশাকগুলি সাধারণত উজ্জ্বল রঙে ডিজাইন করা হয় যেমন নীল, হলুদ এবং কমলা।

লোককাহিনি এবং কিংবদন্তি : রাজস্থানের লোককাহিনি এবং কিংবদন্তির একটি সমৃদ্ধ টেপেস্ট্রি রয়েছে। যা প্রজন্মের মধ্য দিয়ে চলে আসছে। এই গল্পগুলি প্রায়শই রাজপুত যোদ্ধা, বীরত্বের গল্প এবং রোমান্টিক কাহিনিকে ঘিরে আবর্তিত হয়। পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং পান্না ধাইয়ের মতো মহাকাব্যিক ব্যক্তিত্ব তাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের জন্য সম্মানিত।

রাজস্থানের সংস্কৃতি রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং এর জনগণের প্রাণবন্ত চেতনার প্রমাণ। এটি তার বর্ণাঢ্য উদ্‌যাপন, শৈল্পিক অভিব্যক্তি এবং উষ্ণ আতিথেয়তার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে দর্শকদের সমৃদ্ধ ও মুগ্ধ করে চলেছে।

অর্থনীতি

রাজস্থানের অর্থনীতি হলো ভারতের সপ্তম বৃহত্তম রাজ্য অর্থনীতি যার মোট দেশজ উৎপাদন ₹ ১০.২০ লক্ষ কোটি (US$ ১৩০বিলিয়ন) এবং মাথাপিছু জিডিপি ₹ ১১৮,০০০ (US$ ১,৫০০)। এখানে রাজস্থানের অর্থনীতির কিছু মূল দিক উল্লেখ করছি–

কৃষি : রাজস্থানে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত, জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে নিযুক্ত করে। রাজ্যটি গম, বার্লি, ডাল, তৈলবীজ, তুলা, আখ এবং মশলা জাতীয় ফসল উৎপাদনের জন্য পরিচিত। রাজস্থান লবণ চাষের দিক থেকে ভারতের ৩য় স্থানে আছে।

পশুপালন : গবাদি পশু, ছাগল, ভেঙা এবং উটসহ গবাদি পশু দুধ, মাংস, পশম এবং পরিবহনের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। রাজস্থান উটের প্রজনন এবং উটের দুধ উৎপাদনের জন্য ব্যাপক পরিচিত।

কৃষি-ভিত্তিক শিল্প : রাজস্থানের কৃষি-ভিত্তিক শিল্পগুলি রাজ্যের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, তুলা জিনিং, ভোজ্য তেল উৎপাদন এবং দুগ্ধ খামারের সাথে সম্পর্কিত শিল্পগুলি প্রচলিত।

শিল্প : রাজস্থানের একটি ক্রমবর্ধমান শিল্প খাত রয়েছে যেখানে মাইনিং, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং টেক্সটাইল রয়েছে। রাজ্যটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং এখানে চুনাপাথর, মার্বেল, জিপসাম, রক ফসফেট, তামা এবং দস্তার বিশাল আমানত রয়েছে।

রত্ন এবং গয়না : রাজস্থান হলো ভারতে রত্নপাথর কাটা এবং গয়না তৈরির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। জয়পুর, প্রায়শই 'ভারতের রত্ন রাজধানী' হিসাবে পরিচিত। এটি পান্না, রুবি, নীলকান্তমণি এবং পোখরাজের মতো মূল্যবান এবং আধা-মূল্যবান পাথরসহ রত্নপাথরের ব্যবসার জন্য বিখ্যাত।

সিমেন্ট : রাজস্থান ভারতে সিমেন্টের একটি শীর্ষস্থানীয় উৎপাদক। রাজ্যজুড়ে অসংখ্য সিমেন্ট ফ্যাক্টরি রয়েছে। চুনাপাথর এবং অন্যান্য কাঁচামালের প্রাপ্যতা এটিকে সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য একটি আদর্শ স্থান করে তুলেছে।

খনি

রাজস্থানে ৮১টি বিভিন্ন ধরণের বড় এবং ছোট খনি রয়েছে। এখানে সীসা এবং দস্তা আকরিক, সেলেনাইট এবং ওলোস্টোনাইট একচেটিয়াভাবে উৎপাদিত হয়। এখানকার ভিলওয়ারা জেলায় অবস্থিত 'রামপুরা আগুচা মাইন' (আর এ এম) দেশের বৃহত্তম এবং সমৃদ্ধ সীসা-জিঙ্কের আমানত।

রাজস্থানের জনপ্রিয় খাবার

রাজস্থানের খাবার প্রাচীন ঐতিহ্য, ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরার মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত। বেশিরভাগ রাজস্থানী রন্ধনপ্রণালীতে ঘি একটি অপরিহার্য উপাদান এবং অতিথিদের স্বাগত জানানোর ভঙ্গি হিসেবে খাবারের ওপর ঘি ঢেলে দেওয়া হয়। রাজস্থানের খাবার এর রন্ধনপ্রণালী এবং মশলাদার সুস্বাদুর জন্য বিখ্যাত। এ রাজ্যের কিছু জনপ্রিয় খাবার সম্পর্কে বলছি–

ডাল বাটি চুর্মা : এটি রাজস্থানের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং আইকনিক খাবারগুলির মধ্যে একটি। বাটি হলো একটি রুটি যা গমের আটা এবং ঘি দিয়ে তৈরি, যা ঐতিহ্যগতভাবে ডাল (মসুর ডাল তরকারি) এবং চুর্মা (মিষ্টি গুঁড়া সিরিয়াল) দিয়ে পরিবেশন করা হয়। এটি সাধারণত রাজস্থানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহের অনুষ্ঠান এবং জন্মদিনের পার্টিসহ সকল উৎসবে পরিবেশন করা হয়।

লাল মাস : লাল মাস লো ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি একটি জ্বলন্ত মাংসের তরকারি। থালাটির নাম হয়েছে প্রাণবন্ত লাল রঙ থেকে, যা মরিচ ও মশলার ব্যবহার থেকে আসে। রাজস্থানের মাংসপ্রেমীদের মধ্যে এটি একটি জনপ্রিয় খাবার।

গাত্তে কি সবজি : গাত্তে কি সবজি হলো একটি ঐতিহ্যবাহী রাজস্থানি তরকারি যা বেসন ডাম্পলিং দিয়ে তৈরি করা হয় যা একটি মশলাদার দইভিত্তিক গ্রেভিতে রান্না করা হয়। ডাম্পলিংগুলি সাধারণত লাল মরিচের গুঁড়া, হলুদ এবং আজওয়াইন (ক্যারাম বীজ) এর মতো মশলা দিয়ে পাকানো হয়।

কের সাংরি : কের সাংরি হলো একটি অনন্য এবং জনপ্রিয় রাজস্থানি খাবার যা শুকনো মরুভূমির মটরশুঁটি (সাংরি) এবং বন্য বেরি (কের) দিয়ে তৈরি। এই উপাদানগুলিকে মশলা, শুকনো আমের গুঁড়া (আমচুর) এবং সরিষার তেল দিয়ে একত্রে রান্না করা হয় যাতে একটি টঞ্জি এবং সুস্বাদু নিরামিষ খাবার তৈরি হয়। •

রোদ্দুর চয়ন ॥ শিক্ষার্থী

আপনার মতামত জানান

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল

ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯

এক্সটেনশন : ১১৪২

inf2.dhaka@mea.gov.in

ভারত বিচিত্রায় ব্যবহৃত বেশকিছু ছবি ও অলংকরণ ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভারত বিচিত্রা বিক্রয়ের জন্য নয়

পদ্মশ্রী পাওয়া প্রথম অভিনেত্রী নার্গিস দত্ত ॥ প্রকাশ : ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৩

মারুথুর গোপালান রামচন্দ্র
প্রকাশ : ১৭ জানুয়ারি ১৯৯০

কিশোর কুমার
প্রকাশ : ১৫ মে ২০০৩

মুকেশ
প্রকাশ : ১৫ মে ২০০৩

সত্যজিৎ রায় ও পথের পাঁচালি ॥ প্রকাশ : ১১ জানুয়ারি ১৯৯৪

বিশ্ব চলচ্চিত্রের শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত সিটেন্যান্ট ॥ প্রকাশ : ১১ জানুয়ারি ১৯৯৫

ফিলাটেলি

ভারতীয় ডাকটিকিটে চলচ্চিত্র

নিজাম বিশ্বাস

১৯১৩, উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের স্মরণীয় বছর। ওই বছর সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন বাংলা ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং দাদাসাহেব ফালকে এ অঞ্চলের দর্শকের জন্য প্রথমবারের মতো নিয়ে আসেন পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'। মহাভারত ও রামায়নের পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটি ছিল 'নির্বাক'। ভারতীয় ডাকটিকিটেও দাদাসাহেব ফালকে প্রথম চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে উঠে আসেন ১৯৭১ সালে, আর 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের দৃশ্য অবলম্বনে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের পঁচাত্তর বছরপূর্তিতে। ১৯৮৯ সালের ৩০ মে প্রকাশিত ওই টিকিটে 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের একটি দৃশ্যে দেখা যায় সত্যবাদী রাজা হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকায় দামুদার দুবকে, রানি তারামতির ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতা সালুঙ্কে, বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় গজনান বাসুদেবসহ অন্যান্য চরিত্র

ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রস্তুতিপর্বের গুরুত্বপূর্ণ নাম হীরালাল সেন। ১৮৬৬ সালে বর্তমান বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করা হীরালাল ভারতের প্রথম বিজ্ঞাপনচিত্র ও রাজনৈতিক চলচ্চিত্রের জনক। হীরালাল সেন ও মতিলাল সেন দুই ভাই ১৮৯৮ সালে ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র কোম্পানি 'দ্য রয়্যাল বায়োস্কোপ' স্থাপন করেন। হীরালাল নির্মাণ করেছিলেন চল্লিশটির বেশি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। তাঁর দীর্ঘতম চলচ্চিত্র 'আলীবাবা ও চল্লিশ চোর' নির্মিত হয়েছিল ১৯০৩ সালে। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯১৭ সালের এক অগ্নিকাণ্ডে তাঁর চলচ্চিত্রসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়– ভস্মস্তূপে পরিণত হয় 'দ্য রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি'। হীরালাল সেনকে নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশিত না হলেও, ১৯৯০ সালের ১ জানুয়ারি 'ভারতীয় ডাকটিকিট সংস্থা' ও 'সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার' উদ্যোগে প্রকাশ করা হয় একটি বিশেষ সিলমোহর।

১৯৭৭ সালের ৩-১৬ জানুয়ারি 'ষষ্ঠ আর্ন্তজাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' বসে নয়াদিল্লিতে। ওই উৎসবকে

কেন্দ্র করে ভারতীয় ডাকবিভাগ প্রকাশ করে দুই রুপি সমমূল্যের একটি ডাকটিকিট। উৎসব দিয়ে শুরু করা বছরটির শেষাশেষি বিশ্বচলচ্চিত্রে নেমে আসে শোকের ছায়া–২৫ ডিসেম্বর সুইজারল্যান্ডে মৃত্যুবরণ করেন বরেণ্য চলচ্চিত্রকার ও অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন। এই ব্রিটিশ চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ স্মরণীয় করে রাখে ডাকটিকিট প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তারই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় ডাকবিভাগ চ্যাপলিনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম জন্মদিনে প্রকাশ করে পঁচিশ পয়সা সমমূল্যের একটি স্মারক ডাকটিকিট।

ভারতীয় কোনো চলচ্চিত্র তারকাকে প্রথম ডাকটিকিটে দেখা যায় ১৯৯০ সালের ১৭ জানুয়ারি। ৬০ পয়সা সমমূল্যের একটি ডাকটিকিটে উঠে আসেন তামিল নাড়ুর অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ মারুথুর গোপালান রামচন্দ্র। মারাঠি সংগীত ব্যক্তিত্ব ও চলচ্চিত্র প্রযোজক দীননাথ মঙ্গেশকারকে নিয়ে ভারত ডাকটিকিট প্রকাশ করে ১৯৯৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর। এক রুপি সমমূল্যের কমলা রঙের ওই টিকিটে মঙ্গেশকারের প্রতিকৃতির পাশাপাশি তাঁর বহুমাত্রিক পরিচয় পাওয়া যায় সংগীতজ্ঞ, নাট্যকর্মী ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব। রামচন্দ্রকে নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশের একদিন পরেই ডাকবিভাগ আরেকজন চলচ্চিত্র ব্যক্তিকে নিয়ে আসে তাদের ডাকটিকিটে, এবার ১৯৫৫ সালে ভারত সরকারের পদ্মশ্রী উপাধি পাওয়া প্রথম অভিনেত্রী নার্গিস দত্ত। ওই ডাকটিকিটেরও মূল্যমান ছিল এক ভারতীয় রুপি। সত্যজিৎ রায়ের ডাকটিকিটে আগমন ১৯৯৪ সালের ১১ জানুয়ারি। ভারতীয় ডাকবিভাগ ৬ ও ১১ রুপি মূল্যমানের একটি সি-টেন্যান্ট প্রকাশের মধ্য দিয়ে স্মরণ করে বাংলা চলচ্চিত্রের এ কিংবদন্তিকে। ৬ রুপি মূল্যের প্রথম টিকিটে দেখা যায় তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালি'র অপু ও দুর্গার কাশবন পেরিয়ে রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার দৃশ্য ও কাকতাড়ুয়া। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজীবনকে সেলুলয়েডে বেঁধে সত্যজিৎ বিশ্বচলচ্চিত্র বোদ্ধাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন, এবং প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্রকার হিসেবে অস্কার পুরস্কারে ভূষিত হন। পথের 'পথের পাঁচালি'কে মনে করা হয় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চলচ্চিত্র। সিটেন্যান্টের ১১ রুপি মূল্যের টিকিটে নির্মাতার প্রতিকৃতির সাথে অস্কার পুরস্কারটিও উঠে আসে। রায়কে নিয়ে ভারতীয় ডাকবিভাগ একটি সাধারণ টিকিটও প্রকাশ করে ২০০৯ সালের ১ মার্চ। ভারতের সাধারণ টিকিট বা ডেফিনেটিভ স্ট্যাম্পে সত্যজিৎ রায়ই একমাত্র চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্থান পেয়েছেন। ভারত ছাড়াও সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ, টোবালু ও ক্যারিবিয় দ্বীপরাষ্ট্র ডোমেনিকা।

১৮৯৫ সালে প্যারিসে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করে চলচ্চিত্র। এরপর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বিনোদনের এ নতুন মাধ্যম। প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণের শতবর্ষকে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্মরণীয় করে রাখা হয়। ডাকটিকিট প্রকাশ ছিল তার মধ্যে অন্যতম। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো তাই ভারতীয় ডাকবিভাগও প্রকাশ করে দুটি ডাকটিকিটের একটি সিটেন্যান্ট। মূল্যমান ছিল ৬ ও ১১ রুপি।

কাপুর পরিবারের চার প্রজন্মের উত্থান পৃথ্বিরাজ কাপুর থেকে। নির্বাক চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু এবং ১৯৩১ সালে মুক্তি পাওয়া প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'আলম আরা'য় তিনি অভিনয় করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন পৃথ্বি থিয়েটার। মুম্বাইয়ে অবস্থিত সেই থিয়েটারের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভারতীয় ডাকবিভাগ ১৯৯৫ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রকাশ করে একটি স্মারক ডাকটিকিট। দুই রুপি মূল্যমানের ওই টিকিটে পৃথ্বিরাজ কাপুর ও পৃথ্বি থিয়েটারের লোগো উঠে আসে। কাপুর পরিবারের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা রাজ কাপুরেরও দেখা মিলে ডাকটিকিটে। ২০০১ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত চার রুপি মূল্যের ওই টিকিটে রাজ কাপুরের প্রতিকৃতির পাশাপাশি 'মেরা নাম জোকার' ও 'আওয়ারা' চলচ্চিত্রে তাঁর চরিত্র তুলে ধরা হয়। রাজ কাপুর তিনবার অর্জন করেছেন জাতীয় পুরস্কার এবং এগারোবার পেয়েছেন ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড। ১৯৭১ সালে পেয়েছেন পদ্মভূষণ, এবং ১৯৮৭ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। ১৯৯৫ সালে ভারত ডাকবিভাগ চলচ্চিত্রবিষয়ক আরও একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে, ৪ এপ্রিল প্রকাশিত পাঁচ রুপি মূল্যের ওই টিকিটে উঠে আসেন কে. এল. সাইগাল। একাধারে অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী সাইগালকে মনে করা হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম সুপারস্টার।

চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পরিচালক নন্দমুরি তারাকা রামা রাও ডাকটিকিটে উঠে আসেন ২০০০ সালের ২৮ মে। তিনি নিজেকে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হয়েছিলেন অন্ধ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। রামা রাওকে নিয়ে প্রকাশিত ডাকটিকিটের মূল্যমান ছিল তিন ভারতীয় রুপি। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর

মুর্তজা বশীর

জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ব্রিটিশ ভারতের ঢাকায়। পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলায় আধুনিকতার দীক্ষা যাঁদের মাঝে সঞ্চার হয়েছিল তাঁদের অন্যতম মুর্তজা বশীর। তিনি একাধারে চিত্রশিল্পী, কবি, লেখক, চিত্রনাট্যকার, গবেষক, মুদ্রাবিশারদ ও ফিলাটেলিস্ট। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ডাকটিকিট প্রদর্শনীতে তিনি জুরির দায়িত্ব পালন করেন। ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট মৃত্যুবরণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পরম মমতায় সংগ্রহ করেছেন দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট, ধাতব ও কাগুজে মুদ্রাসহ আরও অসংখ্য উপকরণ। ব্রিটিশ ভারতীয় ডাকটিকিট সংগ্রহে প্রচণ্ড যত্নবান ছিলেন, পাশাপাশি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল ভারত প্রজাতন্ত্র থেকে প্রকাশিত ডাকটিকিটের প্রতি। ২০২০ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে গেছেন ভারত প্রজাতন্ত্রের ডাকটিকিট। এ রচনাটি গাঁথা হলো তাঁর সংগৃহীত সেই ডাকটিকিট অবলম্বনে। শিল্পীর বড় মেয়ে মুনীরা বশীর ও 'মুর্তজা বশীর ট্রাস্ট'-এর সহযোগিতায় এ গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহটি আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ : ১৫ মে ২০০৩

মোহাম্মদ রাফি
প্রকাশ : ১৫ মে ২০০৩

সুব্রামানিয়া শ্রীনিবাসান
প্রকাশ : ২৬ আগস্ট ২০০৪

উত্তম কুমার
প্রকাশ : ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯

দীননাথ মঙ্গেশকার
প্রকাশ : ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৩

ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম সুপারস্টার কে. এল. সাইগাল
প্রকাশ : ৪ এপ্রিল ১৯৯৫

নন্দমুরি রামা রাও
প্রকাশ : ২৮ মে ২০০০

ভারতীয় ডাকটিকিটে যুক্ত হয় আরও একটি চলচ্চিত্রবিষয়ক ডাকটিকিট। চার রুপি মূল্যের ওই ডাকটিকিটে দেখা যায় তামিল অভিনেতা সিবাজি গনেশাকে। একই বছরের ১৭ নভেম্বর ডাকবিভাগ প্রকাশ করে মারাঠি চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক ও অভিনেতা শান্তারাম বাপু বা ভি. শান্তারামকে নিয়ে একটি স্মারক ডাকটিকিট। তিনি ১৯৮৫ সালে দাদাসাহেব ফালকে এবং ১৯৯২ সালে পদ্মভূষণে ভূষিত হয়েছেন। প্রায় সাত দশকে তিনি ১০৪টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে প্রদান করা হয় সম্মানসূচক ডক্টরেট। চার রুপি মূল্যমানের ওই টিকিটে শান্তারামের প্রতিকৃতির পাশাপাশি তাঁর অভিনীত একটি চলচ্চিত্রের দৃশ্যজুড়ে দেওয়া হয়।

সংগীত ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রাণভ্রোমরা। অসংখ্য সংগীতশিল্পী, গীতিকার ও সুরকারের রয়েছে ভারতীয় চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদান। ২০০৩ সালে ভারতীয় ডাকটিকিটে আগমন ঘটে শিল্পীদের। শুরুটা তামিল শিল্পী গন্টাসালা ভেঙ্কাটেসওয়ারো রাও-এর ডাকটিকিট প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ১১ ফেব্রুয়ারি রাও-এর ২৯তম মৃত্যুদিবসকে ঘিরে প্রকাশিত ডাকটিকিটটির মূল্যমান ছিল পাঁচ রুপি। ওই বছরের ১৫ মে ডাকবিভাগ আরও চারজন সংগীত ব্যাক্তিত্বকে স্মরণ করে প্রকাশ করে ডাকটিকিট। প্রতিটি পাঁচ রুপি মূল্যের টিকিটে উঠে আসেন কিশোর কুমার, মুকেশ, হেমন্ত কুমার ও মোহাম্মদ রাফি।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষ পূর্তিতে প্রকাশিত সুভেনির
প্রকাশ : ৩ মে ২০১৩

২০০৪ সালে ভারত প্রকাশ করে আরও চারটি চলচ্চিত্রবিষয়ক ডাকটিকিট। আসাম থেকে উঠে আসা প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতা জয়তী প্রসাদ আগারওয়ালাকে পাওয়া যায় ১৭ জুন প্রকাশিত এক টিকিটে। ২৬ আগস্ট প্রকাশিত হয় তামিল চলচ্চিত্রের প্রযোজক ও নির্মাতা সুব্রামানিয়াম শ্রীনিবাসানকে নিয়ে ডাকটিকিট। ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় নির্মাতা কৃষ্ণাসামি সুব্রামানিয়ামকে নিয়ে ডাকটিকিট। ওই বছরের চলচ্চিত্রবিষয়ক শেষ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় ১০ অক্টোবর, মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করা জনপ্রিয় অভিনেতা ও নির্মাতা গুরু দত্তকে নিয়ে। প্রতিটি ডাকটিকিটের মূল্যমান ছিল পাঁচ রুপি।

ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৫৫ সালের ১১ মে প্রতিষ্ঠিত হয় 'চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি'। সংস্থাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের দিয়ে চলচ্চিত্র, শিশু চরিত্র সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র ও শিশুদের দেখার উপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণ করা। প্রতিষ্ঠার পরের বছরই 'জলদেব' নামের একটি অ্যাডভেঞ্চার নির্মিত হয় শিশুদের জন্য। তারপর ১৯৭৯ সালে 'কুম্মট্টি', ১৯৯০ সালে 'অঞ্জলি' এবং ২০০২ সালে 'মাউথ অর্গান' চলচ্চিত্রটি দর্শকের বিপুল প্রশংসা কুড়িয়েছে। নির্মিত হয়েছে অসংখ্য অ্যানিমেশন। 'চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর উপলক্ষে ২০০৫ সালের ১৪ নভেম্বর ভারতীয় ডাকবিভাগ প্রকাশ করে পাঁচ রুপি সমমূল্যের একটি স্মারক ডাকটিকিট।

২০০৬-০৭ সালে আবারও ভারতীয় ডাকটিকিটে যুক্ত হয় চারটি করে চলচ্চিত্রবিষয়ক ডাকটিকিট। ২০০৬ সালের ২২ জানুয়ারি তামিল চলচ্চিত্রের পরিচালক ও প্রযোজক আভিচি মেইপ্পা চেত্তিয়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি তামিল চলচ্চিত্রের 'প্রেমের রাজা' খ্যাত অভিনেতা জেমেনি গণেশা, ৪ আগস্ট সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা পঙ্কজ কুমার মল্লিক এবং ৫ সেপ্টেম্বর পরিচালক এল.ভি. প্রসাদকে নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করে ভারতীয় ডাকবিভাগ। প্রতিটি ডাকটিকিটের মূল্যমান ছিল পাঁচ রুপি করে। ২০০৭ সালের ভারতীয় চলচ্চিত্রবিষয়ক ডাকটিকিটগুলোর মধ্যে প্রথমেই দেখা যায় বিমল রায়কে; প্রকাশের দিন ৮ জানুয়ারি। পরিচালক মেহবুব খানকে নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় ৩০ মার্চ, তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'মাদার ইন্ডিয়া'র দৃশ্যে নার্গিস দত্তের দেখা পাওয়া যায় ওই ডাকটিকিটে। কণ্ঠশিল্পী শচীন দেব বর্মণ ডাকটিকিটে উঠে আসেন ১ অক্টোবর, এসডি বর্মনের প্রতিকৃতির পাশাপাশি তাঁর বিখ্যাত গান 'কে যাসরে ভাটি গাঙ বাইয়া'র দৃশ্যজুড়ে

শান্তারাম বাপু
প্রকাশ : ১৭ নভেম্বর ২০০১

রাজ কাপুর
প্রকাশ : ১৪ ডিসেম্বর ২০০১

শচীন দেব বর্মন
প্রকাশ : ১ অক্টোবর ২০০৭

কৃষ্ণাসামি সুব্রামানিয়াম
প্রকাশ : ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪

চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে প্রকাশিত
প্রকাশ : ১৪ নভেম্বর ২০০৫

আভিচি চেত্তিয়া
প্রকাশ : ২২ জানুয়ারি ২০০৬

দেওয়া হয়েছে টিকিটে। ২০০৭ সালের শেষ চলচ্চিত্রবিষয়ক ডাকটিকিটে উঠে আসেন পরিচালক ঋত্বিক ঘটক, ৩১ ডিসেম্বর প্রকাশিত ওই টিকিটে ঋতিকের পাশাপাশি দেখা যায় তাঁর পরিচালিত 'মেঘে ঢাকা তারা'র 'নীতা' চরিত্রে অভিনয় করা সুপ্রিয়া চৌধুরীকে।

লাস্যময়ী নায়িকা মধুবালাকে নিয়ে ভারত ডাকটিকিট প্রকাশ করে ২০০৮ সালের ১৮ মার্চ। পাঁচ রুপি সমমূল্যের ডাকটিকিটের পাশাপাশি প্রকাশিত হয় একটি স্যুভেনির। ওই সুভেনিরে ব্যবহৃত হয় মধুবালার অভিনীত চলচ্চিত্রের বিভিন্ন চরিত্র। আর 'ভারতের কিংবদন্তি নায়িকা' শিরোনামে ২০১১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির ডাক প্রকাশনায় ছিল টিকিট, স্যুভেনির আর মিনিয়েচারের ছড়াছড়ি। প্রতিটি ডাকটিকিটের মূল্যমান ছিল পাঁচ রুপি করে। প্রথম ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের 'ফার্স্ট লেডি'খ্যাত অভিনেত্রী দেবীকা রানি, তিরিশ ও চল্লিশের দশকে ভারতীয় দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখা দেবীকা রানিকে সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মশ্রী এবং প্রথম দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সুভেনিরের দ্বিতীয় টিকিটে দেখা যায় হিন্দি চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম সেরা অভিনেত্রী নূতনকে, চার দশকে সত্তরটির বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করা নূতন ১৯৭৪ সালে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন; ডাকটিকিটে নূতনের মুখচ্ছবির পাশাপাশি তাঁর অভিনীত 'আনাড়ি' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য জুড়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় টিকিটে উঠে আসেন সুপারস্টার কানন দেবী, মনোমুগ্ধকর অভিনয়ের পাশাপাশি ভারতীয় চলচ্চিত্রের সংগীতেও রয়েছে তাঁর বৈপ্লবিক অংশগ্রহণ, ১৯৬৪ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। চতুর্থ টিকিটে তেলেগু অভিনেত্রী সাবিত্রী, তিনি পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে তুমুল খ্যাতি অর্জন করেন। পঞ্চম টিকিটে হিন্দি চলচ্চিত্রের 'ট্র্যাজেডি কুইন' মীনা কুমারী, তিরিশ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে তিনি নব্বইটির বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। সুভেনিরের শেষ টিকিটে দেখা যায় লীনা নাউডুকে। বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি নায়ক উত্তম কুমার ডাকটিকিটে উঠে আসেন ২০০৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। ওই বছর ১ নভেম্বর প্রকাশিত হয় অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী রাজকুমারকে নিয়েও একটি স্মারক ডাকটিকিট। ২০১৩, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ১০০ বছর। বছরটি বিপুল আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্মরণীয় করে রাখে ভারতীয় ডাকবিভাগ। প্রকাশ করে ৫০টি ডাকটিকিট ও ৬টি সুভেনির শিট। ২০১৩ সালের ৩ মে প্রকাশিত এ ডাক প্রকাশনায় উঠে আসেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের কিংবদন্তিরা। প্রতিটি ডাকটিকিটের মূল্যমান রাখা হয় পাঁচ রুপি করে। ডাকটিকিটগুলোর নকশাকার ছিলেন কামলেশ্বর সিং। প্রথম সুভেনিরে দেখা যায় হিন্দি চলচ্চিত্রের তুমুল জনপ্রিয় অভিনেতা 'দাদামনি' বা অশোক কুমারকে। দ্বিতীয় টিকিটে উঠে আসেন নিউ কলকাতা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও ১৯৭০ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারজয়ী বাংলা চলচ্চিত্র প্রযোজক বিরেন্দ্রনাথ সরকার। তৃতীয় টিকিটে হিন্দি চলচ্চিত্রের পরিচালক ও প্রযোজক বালদেব রাজ চোপরা। চতুর্থ টিকিটে ১৯৯১ সালে দাদাসাহেব ফালকেজয়ী মারাঠি চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক বালজি পেনধারকার। পঞ্চম টিকিটে আসামের সংগীতশিল্পী, কবি ও চলচ্চিত্রকার ভূপেন হাজারিকা, তিনি দ্বিতীয়বারের মতো ভারতীয় ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছেন ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রকাশিত আরও একটি স্মারক ডাকটিকিটে। ষষ্ঠ টিকিটে দেখা যায় হিন্দি চলচ্চিত্রের অভিনেতা ও নির্মাতা দেব আনন্দকে। সপ্তম টিকিটে উঠে আসেন ১৯৭৫ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারজয়ী বাঙালি অভিনেতা ও পরিচালক ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। অষ্টম টিকিটে ১৯৮৩ সালে দাদাসাহেব ফালকেজয়ী হিন্দি ও মারাঠি চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী দুর্গা খোতে। প্রথম সুভেনির শীটের শেষ ডাকটিকিটে দেখা যায় হিন্দি চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার ঋষিকেশ মুখার্জিকে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষ পূর্তিতে প্রকাশিত সুভেনির
প্রকাশ : ৩ মে ২০১৩

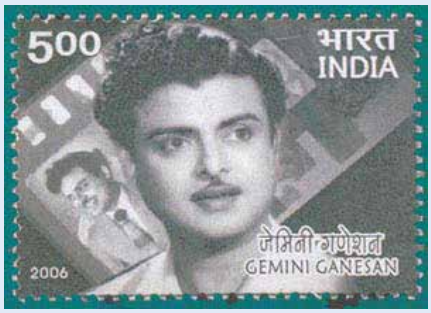

জেমেনি গনেশা
প্রকাশ : ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

এল ভি প্রসাদ
প্রকাশ : ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬

ঋত্বিক কুমার ঘটক
প্রকাশ : ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭

পঙ্কজ কুমার মলিক
প্রকাশ : ৪ আগস্ট ২০০৬

গুরু দত্ত
প্রকাশ : ১০ অক্টোবর ২০০৪

রাজ কুমার
প্রকাশ : ১ নভেম্বর ২০০৯

দ্বিতীয় সুভেনির শিটের শুরুটা হয়েছে উর্দু কবি ও বলিউডের অসংখ্য গানের গীতিকার মাজরুহ সুলতানপুরিকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে। এরপর এসেছেন হিন্দি চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক নওশাদ আলী। বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতা নিতিন বোসকে পাওয়া যায় তৃতীয় ডাকটিকিটে। পৃথ্বিরাজ কাপুর দ্বিতীয়বারের মতো আসেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষকেন্দ্রিক ডাকপ্রকাশনায়। দ্বিতীয় সুভেনিরের পঞ্চম টিকিটে দেখা যায় বাংলা চলচ্চিত্রের অসংখ্য জনপ্রিয় গানের সুরকার রাইচাঁদ বড়ালকে। ষষ্ঠ টিকিটে উঠে আসেন বাগদাদি ইহুদি বংশোদ্ভূত ভারতের নির্বাক যুগের অভিনেত্রী রুবি মায়ার, তিনি ১৯৭৩ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। সপ্তম টিকিটে অভিনেতা ও পরিচালক সোহরাব মোদি। অষ্টম টিকিটে আরেক বাঙালি শক্তিমান পরিচালক তপন সিনহা। দ্বিতীয় সুভেনিরের শেষ টিকিটে দেখা যায় হিন্দি চলচ্চিত্র পরিচালক ও 'ইয়াশ রাজ ফিল্মস'-এর প্রতিষ্ঠাতা ইয়াশ চোপড়াকে।

২০১৩ সালের ডাক প্রকাশনার প্রথম দুটি সুভেনিরে ৯টি করে এবং বাকি চারটি সুভেনিরে ৮টি করে ডাকটিকিট যুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় সুভেনিরে প্রথমেই পাওয়া যায় হাজারের অধিক তেলেগু চলচ্চিত্রে অভিনয় করা জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা আল্লু রামালিংগিয়াকে। দ্বিতীয় টিকিটে চিত্রগ্রাহক অশোক মেহতা। তৃতীয় টিকিটে হিন্দি চলচ্চিত্র ও মঞ্চ অভিনেতা বালরাজ সাহনি। চতুর্থ টিকিটে দেখা যায় তেলেগু চলচ্চিত্রের প্রথম নারী সুপারস্টার ভানুমতি রামাকৃষ্ণাকে। পঞ্চম টিকিটে ১৯৫৫ সালে 'নাজরানা' চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ গল্প ক্যাটাগরিতে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পাওয়া চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার সি. ভি. শ্রীধর। ষষ্ঠ টিকিটে পরিচালক, প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার চেতন আনন্দ। সপ্তম টিকিটে লেখক ও পরিচালক কামাল আমোরহি। তৃতীয় সুভ্যেনিরের শেষ টিকিটে স্থান পেয়েছেন অসংখ্য বাংলা ও হিন্দি গানের কণ্ঠশিল্পী গীতা দত্ত, ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ভারতের কিংবদন্তি শিল্পী শিরোনামে প্রকাশিত ডাকটিকিটমালায়ও স্মরণ করা হয়েছে তাঁকে।

চতুর্থ স্যুভেনিরের শুরুটা হয়েছে তামিল চলচ্চিত্রের অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গীতিকার 'কবিরাসু' বা কান্নাদাসানকে স্মরণের মধ্য দিয়ে। এরপর হিন্দি চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক মদন মোহন কোহলি। তৃতীয় টিকিটে হিন্দি চলচ্চিত্রের কৌতুক অভিনেতা, গায়ক ও নির্মাতা মেহমুদ আলী। চতুর্থ টিকিটে হিন্দি চলচ্চিত্রের অভিনেতা মতিলাল রাজভানশ। পঞ্চম টিকিটে তামিল চলচ্চিত্রের কৌতুক অভিনেতা থাই নাগেশ। ষষ্ঠ টিকিটে হিন্দি চলচ্চিত্রের সংগীত প্রযোজক, গীতিকার ও শিল্পী ওমকার প্রসাদ নায়ার। সপ্তম টিকিটে মালায়ালাম চলচ্চিত্রের 'চির সবুজ নায়ক' খ্যাত অভিনেতা প্রেম নাজির। চতুর্থ স্যুভেনিরের শেষ ডাকটিকিটে উঠে আসেন রাহুল দেব বর্মন।

ভারতীয় চরচ্চিত্রের শতবর্ষকেন্দ্রিক ডাক প্রকাশনার পঞ্চম সুভেনিরে প্রথমে দেখা যায় হিন্দি চলচ্চিত্রের প্রযোজক, পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার রাজ খোসলাকে। এরপর আসেন অভিনেতা রাজেন্দ্র কুমার। তৃতীয় টিকিটে বলিউডের প্রথম সুপারস্টার রাজেশ খান্না। চতুর্থ টিকিটে তেলেগু চলচ্চিত্রের অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক এস. ভি. রাঙ্গা রাও। পঞ্চম টিকিটে অসংখ্য জনপ্রিয় গানের স্রষ্টা, সংগীত পরিচালক ও লেখক সলিল চৌধুরী। ষষ্ঠ টিকিটে হিন্দ্রি চলচ্চিত্র অভিনেতা সঞ্জিব কুমার। সপ্তম টিকিটে দেখা যায় হিন্দি চলচ্চিত্রের গীতিকার, শিল্পী ও সংগীত পরিচালক শংকরদাস কেসারিলাল শাইলেন্দ্রকে। পঞ্চম সুভেনিরের শেষ টিকিটে উঠে আসেন তিনবার ফিল্মফেয়ার শ্রেষ্ঠ গীতিকারের পুরস্কারজয়ী উর্দু কবি শাকিল বাদাউনি।

২০১৩ সালে প্রকাশিত শেষ সুভেনিরে পাওয়া আরও ৮টি চলচ্চিত্রবিষয়ক ডাকটিকিট। প্রথম টিকিটে হিন্দি চলচ্চিত্র অভিনেতা ও পরিচালক শাম্মী কাপুর। দ্বিতীয় টিকিটে হিন্দি সংগীত পরিচালক শংকর এবং জয়কিষাণ। তৃতীয় টিকিটে অভিনেত্রী স্মিতা পাতিল। চতুর্থ টিকিটে হিন্দি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, সংগীতশিল্পী সুরাইয়া। পঞ্চম টিকিটে মুম্বাইয়ের রাজশ্রী প্রোডাকশনের প্রতিষ্ঠাতা তারাচাঁদ। ষষ্ঠ টিকিটে ভারতের দ্য মর্ডান থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা, দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেতা ও পরিচালক টি. আর. সুন্দারাম। সপ্তম টিকিটে বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের শক্তিমান অভিনেতা উৎপল দত্ত। এবং কর্নাটকের অভিনেতা বিষ্ণু ভর্দনকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে ভারতীয় ডাকবিভাগ দেশীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষকেন্দ্রিক ডাকটিকিট প্রকাশের যবনিকা টানে।

চেন্নাইয়ের বিজয়া ভাউহিনি স্টুডিও'র প্রতিষ্ঠাতা ও তেলেগু চলচ্চিত্র প্রযোজক বি. নাগি রেড্ডিকে নিয়ে ভারতীয় ডাকবিভাগ ২০১৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করে একটি স্মারক ডাকটিকিট। ডাকটিকিটটির মূল্যমান ছিল ৫ রুপি। ভারতীয় ডাকটিকিটে চলচ্চিত্র শেষবারের মতো দেখা যায় ২০২৩ সালের ৩০ মার্চ 'ওড়িষ্যার কিংবদন্তি' শিরোনামে প্রকাশিত চারটি ডাকটিকিটের একটি স্যুভেনিরে। অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে ওই সুভেনিরের উঠে আসেন অভিনেত্রী ও পরিচালক পার্বতী ঘোষ, ওড়িষ্যার চলচ্চিত্রে তিনি প্রথম নারী পরিচালক ও প্রযোজক। এই ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয় শিল্পী মুর্তজা বশীরের মৃত্যুর প্রায় ৩ বছর পর, তাই অন্যান্য ডাকটিকিট তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকলেও পার্বতী ঘোষের ডাকটিকিট দেখার জন্য ইন্টারনেট সার্চইঞ্জিনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আরও কিছু ডাকটিকিটের খোঁজ মেলে। ডাক বিভাগ চলচ্চিত্র নিয়ে শুধু ডাকটিকিট প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়নি; একই সাথে উদ্বোধনী খাম, বিশেষ সিলমোহর, ড্যাটা কার্ডসহ রয়েছে আরও ডাক প্রকাশনা। চলচ্চিত্রকে জানার এ ভিন্ন মাধ্যমটি দিনে দিনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। •

বিমল রায়
প্রকাশ : ৮ জানুয়ারি ২০০৭

মধুবালা
প্রকাশ : ১৮ মার্চ ২০০৮

নিজাম বিশ্বাস ॥ কবি ও গবেষক

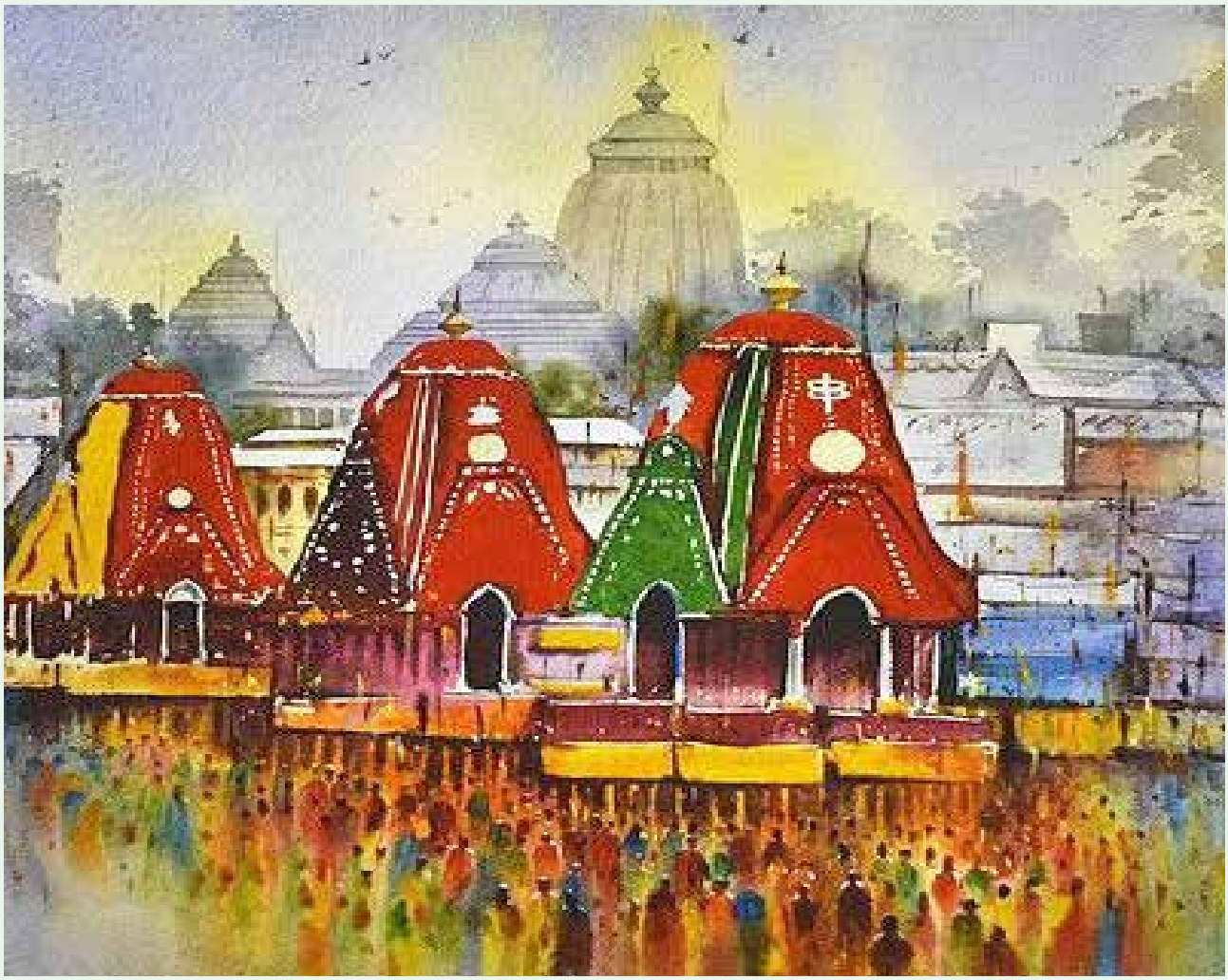

নিবন্ধ

ভক্ত-ভগবানের মিলনোৎসব

সরস্বতী রানী পাল

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি অন্যতম মহোৎসব প্রতি আষাঢ় মাসের শুক্লা পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে অনুষ্ঠিত 'রথযাত্রা'। রথযাত্রা বা রথদ্বিতীয়াতে শ্রীবিষ্ণুকে ভক্তি ভরে রথারোহণ সময়ে বা গমনে দর্শন করলে বিষ্ণুলোকে বাস হয়ে থাকে; এমন একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই রথযাত্রা উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। ভারতের ওড়িষ্যা, ছত্তীসগঢ়, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, অসম, মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তাঁর পূজা বিভিন্নভাবে প্রচলিত। সনাতন বিশ্বাস মতে, জগন্নাথ দেবই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। প্রভু জগন্নাথ হচ্ছেন জগতের অধিপতি। তিনি পরমাত্মা পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি রূপ। তিনিই পরমপ্রভু, যার উদ্দেশে নিবেদিত জীব জগতের সব কিছু। 'জগন্নাথ' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় : জগৎ+নাথ= জগতের নাথ অর্থাৎ ভগবান। আভিধানিক অর্থে, জগন্নাথ অর্থাৎ 'জগতের নাথ' বা 'জগতের প্রভু' হলেন হিন্দু দেবতাদের মধ্যে অন্যতম

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় রথযাত্রা উৎসব উদ্‌যাপনের ধারণাটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। অথর্ববেদ, শ্রীব্রহ্মপুরাণ, শ্রীনারদপুরাণ, শ্রীস্কন্দপুরাণ (উৎকল খণ্ড), শ্রীকূর্মপুরাণ, শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীভবিষ্যপুরানীয় শ্রীপুরুষোত্তমমাহাত্ম্য, শ্রীনীলাদ্রিমহোদয়, শ্রীবিষ্ণুরহস্য প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীজগন্নাথদেবের ও শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিবরণাদি দৃষ্ট হয়

প্রাচীন রথযাত্রার ইতিহাস হিসেবে প্রধানত বিশ্বাস করা হয়– শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সমন্ত পঞ্চক তীর্থে অবগাহন করতে যান। এ রীতি অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণ একবার দ্বারকা থেকে কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। এই পুণ্যস্নানে বৃন্দাবন থেকে ব্রজবাসীরাও অংশগ্রহণ করেন। স্নান সমাপনান্তে ব্রজবাসীরা খবর পেলেন, শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে এসেছেন। তারপর তারা দলে দলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভে উপস্থিত হলেন। ব্রজবাসীরা বলতে শুরু করলেন, ব্রজের রাখাল প্রেমময় শক্তির আধার শ্রীকৃষ্ণকে আমরা নিয়ে যাব আমাদের মাঝে ব্রজধামে। সবাই ঠিক করল রথের রশি ধরে তারা টানতে শুরু করবে। সেই রশি ধরে টানতে টানতে তারা রথে আসীন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম আর সুভদ্রাকে নিয়ে চলে আসে ব্রজধামে। সেই সময়কে স্মরণ করেই 'রথদ্বিতীয়া' বা 'রথযাত্রা উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে হাজার বছর ধরে। এভাবেই শুরু হয়েছে ভক্ত-ভগবানের মিলনমেলার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন রথযাত্রার উৎসব।

শাস্ত্রকথা

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় রথযাত্রা উৎসব উদযাপনের ধারণাটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। অথর্ববেদ, শ্রীব্রহ্মপুরাণ, শ্রীনারদপুরাণ, শ্রীস্কন্দপুরাণ (উৎকল খণ্ড), শ্রীকূর্মপুরাণ, শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীভবিষ্যপুরানীয় শ্রীপুরুষোত্তমমাহাত্ম্য, শ্রীনীলাদ্রিমহোদয়, শ্রীবিষ্ণুরহস্য প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীজগন্নাথদেবের ও শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিবরণাদি দৃষ্ট হয়। এছাড়া, শ্রীমৎস্যপুরাণ, শ্রীবরাহপুরাণ ও প্রভাসখণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রানুসারে, রথযাত্রা উৎসব বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। যেমন : ঘোষযাত্রা, মহাবেদী-মহোৎসব, পতিত-পাবন যাত্রা, দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা, নব দিন যাত্রা, দশাবতার যাত্রা, গুণ্ডিকা মহোৎসব এবং আরপ যাত্রা। উৎসবে কাঠের তৈরি রথে করে কাঠের তৈরি বিগ্রহকে পরিভ্রমণ করানো হয়-এটিই মূল বিষয়। কথিত আছে, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাদা বলরাম এবং বোন সুভদ্রাকে নিয়ে রথে করেই বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেই স্মৃতি থেকেই মূলত এই উৎসব আজও পালিত হয়।

পুরাণ কথা

রথের সাধারণ অর্থ 'যানবিশেষ'। প্রাচীন যুগে যোদ্ধাগণ শক্তিশালী রথ চালাতেন শত্রুদের ওপর বিজয় লাভের জন্য। ভবিষ্যৎপুরাণ অনুসারে, সূর্যদেবের জন্য ভাদ্র মাসে একটি রথ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 'বিষ্ণুপুরাণ', 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' ও 'পদ্মপুরাণ'-এ রথযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ভবিষ্যোত্তর পুরাণ' অনুসারে, শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ভগবান মহাবিষ্ণুর জন্য একটি রথযাত্রা করতেন, যা পরবর্তীকালে গন্ধর্বগণ অনুসরণ করতেন। বিভিন্ন পুরাণ যেমন, পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ অনুসারে ভগবান বিষ্ণুর ভক্তগণ কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে (শুক্লপক্ষের ১২তম দিন) চাতুর্মাসের শেষে রথযাত্রা উৎসব উদ্‌যাপন করতেন। তাঁরা রথের মধ্যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর একটি বিগ্রহ স্থাপন করতেন এবং সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রথকে টানতেন। ভারতবর্ষের উড়ুপিতে শ্রী মাধবাচার্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বিগ্রহকে নিয়ে রথযাত্রা উৎসব উদযাপিত হয়। ভগবান শিবের ভক্তগণ চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে (শুক্লপক্ষের ৮ম দিন) মহাদেবের জন্য রথযাত্রা উদযাপন করেন। নেপালে ভক্তগণ বৈশাখ মাসের প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনের ভৈরব এবং ভৈরবী (শিব এবং মাতা পার্বতী) বিগ্রহ নিয়ে রথযাত্রা উদযাপন করেন। 'দেবী পুরাণ' অনুসারে ভক্তগণ কার্তিক মাসে মহাদেবীর জন্য রথযাত্রা উৎসব পালন করেন। যা পূর্ণিমার দিন এবং শুক্লপক্ষের তৃতীয়া থেকে পঞ্চমী পর্যন্ত এবং সপ্তমী থেকে একাদশী পর্যন্ত (৭ম থেকে ১১তম দিন) উদযাপন করা হয়।

স্নানযাত্রা বা স্নানোৎসব

কালানুক্রমিক বিবরণ অনুযায়ী, রথোৎসব শুরু হয় জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দিয়ে। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুরীতে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। স্কন্দ পুরাণানুসারে, রাজা ইন্দ্রদুম্ন যখন জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা দেবী কাঠের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এই স্নানযাত্রা বা স্নানোৎসব পালন করেন। মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে জগন্নাথ, সুভদ্রা, মহারানীকে স্নান বেদীতে আনয়ন করা হয়। সুগন্ধি জল, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, গঙ্গাজল, বিভিন্ন প্রকার ফলের রস ও ডাবের জল দিয়ে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে স্নান বা অভিষেক করানো হয়। স্নানের পর শুরু হয় মূর্তির সাজসজ্জা। ভক্তবৃন্দ প্রভু জগন্নাথদেবকে অভিষেক করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, শঙ্খধ্বনি ও গোলকের প্রেমধন মহাহরিণাম সংকীর্তনযোগে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী চলে অভিষেকের আনুষ্ঠানিকতা। কথিত আছে, ১০৮ ঘড়া জলে স্নানের পর জ্বরে কাবু হয়ে পড়েন জগন্নাথ দেব। তাই এই সময় তাঁকে গৃহবন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়। রথযাত্রা পর্যন্ত বিশ্রাম নেন তিনি। অভিষেক অন্তে ভক্তবৃন্দদের মাঝে জগন্নাথদেবের অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্নানযাত্রা শেষে ভগবান শ্রীজগন্নাথদেব গজবেশ ধারণ করেন। এরপর ১৫ দিন পর্যন্ত জগন্নাথদেব অসুস্থ লীলা প্রকাশ করেন। এই সময়কে 'অনাবৎসর' কাল বলা হয়। এ সময়কালে ভগবান ভক্তদের দর্শন প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অসুস্থ লীলা করার জন্য ভগবানকে নৈবদ্য প্রদান করার পরিবর্তে ঔষধি গুল্ম নিবেদন করা হয়। ১৬তম দিনে জগন্নাথদেবকে সকলের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং এইদিন থেকে রথযাত্রা শুরু হয়।

রথযাত্রা শুরুর পনেরো দিন পূর্বে জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমায় স্নানের বিশেষ তাৎপর্য বিষয়ে পণ্ডিতরা মনে করেন, প্রকৃত অর্থে, এ স্নান ধরিত্রীরই স্নান। একে ইংরেজিতে বলা হয় Sympathetic magic। সূর্য বা ধরিত্রীর প্রতীককে স্নান করালে অনাবৃষ্টি দূর হবে এ বিশ্বাসই রয়েছে এর মূলে। মূলত এর মধ্য দিয়েই রথযাত্রা উৎসবের সূচনা হয়।

রথযাত্রা বা রথোৎসব

পুরীতে ভগবান জগন্নাথদেবের রথযাত্রা একটি অদ্বিতীয় উৎসব যা ভারতবর্ষ এবং গোটা বিশ্বে বিখ্যাত। ভগবান জগন্নাথদেব ভক্তদের কৃপা করার জন্য রাজপথে নেমে আসেন। মূলত এটিই প্রভুর শুভযাত্রা যা রথযাত্রা বলে পরিগণিত। ভক্তগণ ভিড় করেন ভগবান শ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলদেবকে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করার জন্য। পুরীর রথযাত্রা উৎসবের মূল দর্শনীয় হলো তিন জন অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ, ভাই বলরাম বা বলভদ্র ও বোন সুভদ্রার জন্য আলাদা আলাদা তিনটি রথ। প্রথমে যাত্রা শুরু করে বড় ভাই বলভদ্রের রথ–তালধ্বজ। তারপর যাত্রা করে সুভদ্রার রথ –দর্পদলন। সর্বশেষে থাকে জগন্নাথদেবের রথ–নন্দীঘোষ। এসময় প্রাচীন মন্দির থেকে বিগ্রহ বের করে নিয়ে এসে বৃহৎ রথের উপর স্থাপন করা হয়। জগতের নাথ প্রভু জগন্নাথের এই উৎসবে ভক্তবৃন্দ জগন্নাথদেবকে পালাক্রমে জয়ধ্বনি দিতে দিতে রথের দড়ি টেনে নিয়ে যেতে থাকেন। একদিকে পুরুষেরা শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসা, ঢাক, ঢোল বাজিয়ে পরিবেশ মুখর করে তোলেন অন্যদিকে নারীরা উলুধ্বনি ও মঙ্গলধ্বনির মাধ্যমে রথটানায় আনন্দচিত্তে শামিল হন। রথ থেকে পথে দাঁড়ানো দর্শনার্থীদের দিকে ছুড়ে দেওয়া হয় কলাপাতায় মোড়ানো চিনি ও গোটা কলা, ধানের খৈ, নকুল, বাতাসা এবং লটকন ফলবিশেষ। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রথে চড়ে 'গুণ্ডিচার' বাড়ি যান। যা জগন্নাথ দেবের 'মাসির বাড়ি' নামে পরিচিত। জগন্নাথ দেবের 'মাসির বাড়ি' পর্যন্ত রথ চড়ে যাওয়াকে বলে 'সোজা রথ'। এরপর সাতদিন মাসির বাড়িতে থাকার পর সেই রথে চড়েই পুনরায় নিজের মন্দিরে ফেরেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। তাঁর মাসির বাড়ি

থেকে মন্দিরে ফিরে আসার এই যাত্রা 'উল্টো রথ' নামে প্রসিদ্ধ।

পুরীর রথযাত্রা কালক্রমে শুধু পুরীতেই নয়, উৎসবের প্রচলন ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে। ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের রথযাত্রা ও মহেশের জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপমহাদেশ বিখ্যাত। হুগলির শ্রীরামপুরে মাহেশের রথযাত্রা, পূর্বমেদিনীপুরের মহিষাদলের রথযাত্রা, মায়াপুরের ইস্কন মন্দিরের রথযাত্রা খুবই প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিকমণ্ডলীর তথ্য মতে, 'মাদলা পঞ্জী' নামে একটি কালানুক্রমিক বিবরণ (ষোল দশক) অনুসারে শ্রীজগন্নাথ মন্দির থেকে গুণ্ডিচা মন্দিরের মধ্যে 'মালিনী নদী' নামে একটি নদী ছিল যা 'বড়া নাই' বা বড়ো নদী নামেও পরিচিত ছিল। সে সময়ে রাজার ছয়টি রথ থাকত। শ্রীজগন্নাথদেব, বলরাম এবং সুভদ্রা, সাথে সুদর্শন চক্রকে নদীর দিকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনটি রথ ব্যবহৃত হত। এরপর বিগ্রহগুলি নদীর অপর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হতো এবং সেখান থেকে গুণ্ডিচা মন্দির পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেব, বলরাম এবং সুভদ্রাকে বহন করার জন্য আরও তিনটি রথ নিযুক্ত হত। তেরোর শতকে রথযাত্রা উৎসব উদযাপন করা হয়েছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে 'রথ চকড়' নামে গ্রন্থে। গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী, আট-এর শতকে রাজা যযাতি কেশরী রথযাত্রা উৎসব উদযাপন হয়ে আসছে। যখন থেকে তিনি শ্রীজগন্নাথদেব, বলরাম এবং সুভদ্রা দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

'রথ' মানেই রথের মেলা। মেলার সময় হয়ে ওঠে আধ্যাত্ম সাধনায়, চিত্তবিনোদনের, ব্যবসা-বাণিজ্য, লোক-সংস্কৃতি চর্চার এক বড় কেন্দ্র। এ মেলা বসে আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে অর্থাৎ রথযাত্রা শুরুর দিন। শাস্ত্রমতে, রথের দড়ি স্পর্শ করলে বা রথ দর্শন করলে পুনর্জন্মের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অর্থাৎ 'মুক্তি' ঘটে। জগন্নাথদেব শ্রীকৃষ্ণেরই আর এক রূপ। নতুন রূপের এ ভগবানকে ভক্তরা শ্রদ্ধা জানান এ রথ টানার মাধ্যমে।

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় বিভিন্ন মন্দির ও সেবাশ্রমের উদ্যোগে রথোৎসব হয়। ঢাকার স্বামীবাগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ-এর উদ্যোগে প্রতি বছর রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়ে থাকে। তিনটি সুবিশাল রথসহ রথের শোভাযাত্রা স্বামীবাগ আশ্রম থেকে শুরু হয়ে জয়কালী মন্দির– ইত্তেফাক মোড়-শাপলা চত্বর-দৈনিক বাংলা মোড়-রাজউক ভবন-গুলিস্তান-পুলিশ হেডকোয়ার্টার-সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল-হাইকোর্ট মাজার-দোয়েল চত্বর-শহিদ মিনার-জগন্নাথ হল ও পলাশী হয়ে শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা আট দিনব্যাপী উৎসব পালিত হয় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে। এছাড়া, পুরান ঢাকার চন্দ্রমোহন বসাক লেনের বনগ্রামে অবস্থিত রাধাগোবন্দি জিউ মন্দির, সূত্রাপুরের শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দির, ইসকন হরেকৃষ্ণ নামহট্ট কেন্দ্রীয় কার্যালয়, শ্রী শ্রীধর চক্র জিউ বিগ্রহ ও শ্রীশ্রী বংশীবদন জিউ বিগ্রহ মঠ এবং পুরনো ঢাকার শাঁখারীবাজার একনাম কমিটির পরিচালনায় প্রতি বছর রথটান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথ জিউ ঠাকুর মন্দিরের রথযাত্রা তাঁতিবাজার থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। রাজধানীর জয়কালী রোডের রামসীতা মন্দিরে রথ টান উৎসব হয়ে থাকে। পুরান ঢাকার ৪২/২ হাটখোলা রোড, টীকাটুলিতে অবস্থিত শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু মহাপ্রকাশ মঠ-এর আয়োজনে পালিত হয় রথ যাত্রা উৎসব। ঢাকার রায়ের বাজারের শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর আখড়া মন্দিরে এবং ঢাকেশ্বরী জাতীয় রথোযাত্রা উপলক্ষ্যে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পদাবলী কীর্তন, আলোচনা সভা এবং উল্টোরথের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির হতে স্বামীবাগ আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

প্রাচীনত্ব

রথযাত্রা বাঙালি হিন্দুর অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। জগন্নাথদেবের আরাধনাই এ উৎসবের মূল কথা। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, সময়ের বিচারে বাংলার রথযাত্রা যে খুব বেশি প্রাচীন তা বলা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মান্যগ্রন্থ 'হরিভক্তি বিলাস' এ রথযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলার প্রসিদ্ধ ধর্ম সংস্থাপক রঘুনন্দনের 'তীর্থতত্ত্ব' ও 'যাত্রা' গ্রন্থেও এর উল্লেখ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জগন্নাথদেবের রথোৎসবের চেয়ে দেবতাকে রথে চাপিয়ে পূজা করার রীতিটি বেশ প্রাচীন। হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্রে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন উপলক্ষে, বিভিন্ন দেবতার রথযাত্রার কথা বলা হয়েছে। পুরাণে অনেক দেবদেবীর রথযাত্রার উল্লেখ রয়েছে। যেমন কূর্ম ও ভবিষ্য পুরাণে সূর্যদেবের রথযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবীপুরাণে মহাদেবীর রথযাত্রা ও পদ্মপুরাণে আছে বিষ্ণুর রথযাত্রার কথা। এছাড়া কৃষ্ণ, শিব ও পার্শ্বনাথ-এর রথযাত্রার কথাও শোনা যায়। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বুদ্ধদেবের রথযাত্রা'র বিবরণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'ভ্রমণবৃত্তান্তে' বৈশাখী পূর্ণিমায় রথযাত্রার কথা পাওয়া যায়। এসব রথযাত্রার সময়কালও ভিন্ন। বিদেশেও এ ধরনের রথযাত্রার প্রচলন রয়েছে। নেপালে হয় দেবীযাত্রা, কুমারী যাত্রা, ভৈরব যাত্রা, লিঙ্গযাত্রা, মৎস্যেন্দ্র যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠান। ইউরোপে হয় মা মেরীর রথযাত্রা। কালের প্রভাবে অন্যান্য দেবদেবীর রথযাত্রার প্রচলন কমে এলেও জগন্নাথদেবের রথযাত্রা হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে।

ভক্ত-ভগবানের মিলনোৎসব

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, জগন্নাথ দেব হলেন জগতের নাথ বা অধীশ্বর। জগৎ হচ্ছে বিশ্ব আর নাথ হচ্ছেন ঈশ্বর। তাই জগন্নাথ হচ্ছেন জগতের ঈশ্বর। তার অনুগ্রহ পেলে মানুষের মুক্তিলাভ হয়। জীবরূপে তাকে আর জন্ম নিতে হয় না। এ বিশ্বাস থেকেই রথের ওপর জগন্নাথ দেবের প্রতিমা রেখে রথ নিয়ে যাত্রা করেন প্রভু ভক্তগণ।

পণ্ডিতদের মতে, রথযাত্রার কল্পনা মূলত এসেছে সূর্যোপাসনা থেকে। শুরুতে আদি মানব সর্বপ্রাণবাদের (Animism) ধারা অনুযায়ী অধ্যাত্ম সাধনার সূচনা ঘটিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ছিল সূর্য। সূর্য সৃষ্টির মূল। বিজ্ঞান মতে, সূর্য থেকেই পৃথিবীর জন্ম, সূর্যেই প্রাণের উৎস। রবীন্দ্রনাথ ধরিত্রীকে বলেছেন 'সূর্য সনাথ'। অর্থাৎ সূর্যই ধরিত্রীর নাথ বা প্রভু। এ কারণেই সূর্য বন্দনার রীতিটি খুবই প্রাচীন। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে যে ঋতুচক্র আবর্তিত হয় তার সূত্রেই পৃথিবী শস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আলোচ্য 'রথ' সেই সূর্যেরই প্রতীক; আর 'রথযাত্রা' মানে সে সূর্যকে এগিয়ে নেওয়ার একটি প্রক্রিয়া। আদিম সমাজ তথা Primitive People এর ধারণা ছিল যে সূর্য এখন দক্ষিণায়নে। তাকে ঠেলে এগিয়ে না দিলে তার পথচলা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই রথোৎসব হলো রথের প্রতীক সূর্যকে এগিয়ে নেওয়া নৃতত্ত্ববিদগণ যাকে বলে থাকেন Sympathctic Magic।

প্রাচীন 'রথযাত্রা' একটি অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব এবং বাঙালির সংস্কৃতি ও সাহিত্যেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতি আষাঢ় মাসের শুক্লা পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিটি অত্যন্ত শুভ একটি দিন বলে মনে করেন প্রভু জগন্নাথদেবের বিশ্বাসী ভক্তগণ। রথদ্বিতীয়ার পুণ্যতিথিতে–গৃহারম্ভ, দেবগৃহপ্রবেশ, দেবতাগঠন, (দেবতা প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা, শিবপ্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা), মুখ্যান্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, নববস্ত্রপরিধান, নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ (পুংরত্নধারণ জলাশয়ারম্ভ), নৌকাচালন, নৌকাযাত্রা, ক্রয়বাণিজ্য, বিপন্যারম্ভ পুণ্যাহ রাজদর্শন, নাট্যারম্ভ, ঔষধিকরণ ও সেবন, হলপ্রবাহ, বীজবপন, বৃক্ষাদিরোপণ, ধান্যচ্ছেদন, ধান্যস্থাপন, ধান্যাদিবৃদ্ধিদান, নবান্ন, শিল্পারম্ভ, কুমারীনাসিকাবেধ, কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন বাহন ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি কাজগুলো শুরু করা শুভ। এছাড়া ভক্ত তাঁর আস্থায় পুণ্য ফললাভের জন্য সকল কর্মই এইদিনে শুরু করা যেতে পারে। তাহলে কর্মের সমাপ্তিও শুভ হয়ে থাকে বলে মনে করা হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাস মতে, 'জয় জগন্নাথ' শব্দোচ্চারণে রথ দর্শনে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। শ্রদ্ধা-ভক্তিভরে সাধ্যমতো ফুল-ফল-চন্দনজল আর তুলসিপত্রে প্রভু জগন্নাথদেবকে তুষ্ট করা যায়। প্রবাদ মতে, মানুষ যে রথের মেলায় যায় তার উদ্দেশ্য–একসঙ্গে 'রথ দেখা; আর 'কলা বেচা'র কাজ সারা। 'রথ দেখা' মানে জগন্নাথদেবকে দর্শন ও রথের দড়ি স্পর্শ করে পুণ্য অর্জন করা; আর 'কলা বেচা' মানে মেলার আনন্দ উপভোগ করা। এই কারণে রথযাত্রায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ, পুণ্যার্থী-দর্শনার্থী বহু মানুষের সমাগম ঘটে থাকে। সনাতন ধর্মে, আষাঢ় মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাদ্বিতীয়া তিদথিতে 'রথযাত্রা' উৎসবে জগন্নাথ দেবকে দর্শন পুণ্যির কাজ। উৎসবের মধ্য দিয়ে ভক্ত আর ভগবানের মধুমিলন ঘটে। সেই পুণ্যকর্মে সকলের সমান অংশীদারের জন্য রথযাত্রা'র শুভ কামনা আর ভক্তিযুক্ত মনে করজোড়ে প্রার্থনা 'জয় জগন্নাথ'...। •

সরস্বতী রানী পাল ॥ গবেষক

প্রথা ভাঙ্গার কবি
প্রভাত চৌধুরী
রাহুল গাঙ্গুলী

প্রভাত চৌধুরী (জন্ম ১৯৪৪–মৃত্যু ১৯ জানুয়ারি ২০২২) ছিলেন বাংলা সাহিত্যের পোস্ট-মডার্ন কবিতার ধারার পুরোধা ব্যক্তিত্ব। বাংলায় পোস্ট-মডার্ন কবিতাচর্চার পথিকৃৎও তিনি। প্রথাভাঙনের কবি হিসেবেও পরিচিত তিনি।

প্রথমেই মৃদু বকা; কারণ এনভেলাপের মধ্যে থাকা মূল পাণ্ডুলিপিতে যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন নং, কিছুই ছিল না। অর্থাৎ, এনভেলাপটি ফেলে দিলে এই পাণ্ডুলিপি কার, তা বোঝার কোনো উপায়ই নেই। অতএব, তিনি এনভেলাপটিকে বাতিলের ঝুড়ি থেকে পুনরাবিষ্কার করে, আমার সাথে যোগাযোগ করেন। তারপর কবিতা নিয়ে কিছু প্রাথমিক আলোচনা। এভাবেই আরেকটা নতুন শুরু। চোখের সামনে দেখলাম কবিতায় কবির যাপন কেবলই নয়; সে যাপনের আগুনে পুড়িয়ে সামনের মানুষটিকে সহজে অবলীলায়, মানুষটির অজান্তে শুদ্ধ করে তুলতে পারেন কেউ। এক মারাত্মক ধনাত্মক মহাজাগতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ মানুষ। তারপর, কবিতাপাক্ষিকের আগামী একটি সংখ্যায় আমার মতন পথউঠতি তরুণের কবিতা প্রকাশ এবং সাথে এডিটোরিয়াল নোটে আমার কথা। আমাকে তুলনা করলেন স্লগ ওভারে নামা এক ব্যাটসম্যান... আরো বললেন এই কাজটা একজন সম্পাদক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। পরবর্তী বইমেলায় যেচেই প্রকাশ করলেন প্রথম কবিতার বই 'নো ম্যানস ল্যান্ড।' শুধুই আমার নয়, আমার মতোন এরকম বহু তরুণকেই তিনি কাছে টেনে নিয়েছিলেন। যেন তারুণ্যের অহংকারে থাকা দায়িত্বশীল শক্তিশালী ঋজুতায় ভরপুর কেউ। মনে পড়ে, বইমেলায় যখন ওনার লেখা কবিতার বই 'সাক্ষাৎকার' ও 'আবার সাক্ষাৎকার' সংগ্রহ করি। উনি হাতে তুলে দিয়েছিলেন কবিগুরুর শেষ রচনা 'রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথ'। বলেছিলেন, আমার এই বইগুলো পড়লে এমন একটি মানসিক অবস্থান তৈরি হবে, যা কবির স্বাভাবিক শৈলীর বেড়ে ওঠাকে ধ্বংস করে দিতে পারে; বা সহজকথায় লেখার প্যাটার্ন প্রভাত চৌধুরীর মতো হয়ে উঠবে, যা কবিতা সৈনিক হিসেবে আমি চাই না, সুতরাং সেই মানসিক জগদ্দলতাকে কাটাতে সমাধান হলো রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচিত এই বইটি। শিখলাম কবির নিজস্ব শৈলী বা শৈল্পিক প্যাটার্ন স্বতন্ত্র; একে কপি পেস্ট করা যায়; কিন্তু কবির স্বতন্ত্র যাপনভাবনাকে আয়ত্ত করা যায় না। পোস্টমডার্নসংক্রান্ত যেকোনো আলোচনায় তাঁর ছিলো অকপট স্বীকারোক্তি–আমি এবিষয়ে তাত্ত্বিক নই, সমীরদা বলতেন (কবি সমীর রায়চৌধুরী)–এটা আমার মধ্যে ইনবিল্ট্ অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবেই স্বয়ং বিকশিত। আমরা যখন পোস্টমডার্নকে পেরনোর কথা বলি, তিনি বারংবার বলেছেন 'কবিতাকে আপডেট' করো, নিজেকে আপডেটেড রাখো। আরো বলতেন, কবিতার নানান নতুনত্ব আমার ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগায় সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, আমার সেই নতুনকে স্বাগত জানানোই কবিতার হয়ে কাজ। বিভিন্নভাবে প্রথাভাঙ্গাকে তিনি সর্বদাই অ্যাকসেপ্ট কেবল করেননি, পক্ষ নিয়ে বিতর্ক পর্যন্ত করেছেন। বারবার বলেছেন প্রথাভাঙার হাতিয়ার হলো গদ্য। তুমি গদ্য লেখ, তোমার প্রথাভাঙাকে গদ্য দিয়ে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করো। সঠিক বানান ও ব্যাকরণ নিয়ে ওনার একটা একপেশেতা নিয়ে মতান্তর আমাদের অনেকের সাথে হয়েছিল; আসলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, সঠিক প্রয়োগ না শিখে প্রথাভাঙার প্রচেষ্টা একটা মূর্খতা, কারণ অচিরেই তা গতিকে কোনো না কোনো সময় রুদ্ধ করে দেবেই; আবার ফিরতে হবে শেকড়ে। তেমনই, সে সময়ে জীবনানন্দের ওপর সাংঘাতিকভাবে ইয়েটসচিতো প্রভাব, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নতুনতরো কাজ, এসব অনেক বিষয় নিয়ে প্রভাতদার সাথে তুমুল তর্ক হয়েছে। এমনকি কিছু জিনিস নিয়ে ভুলও বুঝেছি ওনাকে; অথচ তারপরও যখনই গেছি, হাসিমুখে ওনার সেই বক্তব্য : সামনের সংখ্যার জন্য কয়েকটা কবিতা দিয়ে যাও। যেন উনি জানতেন, ভুল বুঝলেই আবার ব্যাক টু ৪৯ পটলডাঙা হবেই।

কবিতা লেখা একটা শৈল্পিক টেকনিক; তাই ওনার আত্মপক্ষ ছিলো, 'কবি যা লেখেন সেটাই কবিতা, আর কবিতা যিনি লেখেন তিনিই কবি।' এমনও হয়েছে, কোনো অনুষ্ঠানে কোনো পূর্বপরিকল্পিত লেখা কবিতা ছাড়াই, মাইকে এসে তৎক্ষণাৎ মনে মনেই একটা কবিতা বানিয়ে পড়েছি। উনিও তারপর এসে সেরকমই একটা কবিতা বানিয়ে পাঠ করলেন, যে কবিতাটি লেখাই হয়নি। এই মজাটাকে নাম দিয়েছিলাম 'ইনস্ট্যান্ট পোয়েট্রি'। দেখেছি, হাসপাতালের বিছানায় বসেও একজন কবি কবিতা লিখতে পারেন। আসলে, উনি সেরকমই একজন কবি, যাঁর চেতনা আন্দোলনকৃত জারণ-বিজারণ, মস্তিষ্ক থেকে স্পাইনল কর্ডগামী ভাবনার প্রতিটা কোষ থেকে কোষরন্ধ্রের মজ্জায় মজ্জায় টইটম্বুর। যেটা বাংলা কবিতায় খুব কম সাধকই করে উঠতে পেরেছেন। আর তিনি তো কেবলই কবি নন, কবিতা সৈনিক; তাই তাঁর আত্মপক্ষ : কবির 'টোটাল পোয়েট্রি', প্রথাভাঙনের লেখা থেকে ছাপাখানার শিরা-উপশিরা হয়ে স্বশরীরে পাঠকের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস। চারপাশটা এখন যত দেখি, বুঝতে পারি, মাথার ওপর এরকম দীর্ঘছায়া প্রদানকারী মানুষ ক্রমশই খুবই দ্রুত হারে কমছে; আর শরীরের দৈর্ঘ্য যখন ছায়ার চেয়ে বেড়ে যায়, তখন সময়টা অস্তাচল, এটা আমরা সকলেই জানি। এরকমভাবে তরুণদের সাথে আপন নৈকট্যের কারণেই বোধহয় এখনও 'কবিতাপাক্ষিক' পত্রিকা স্বমহিমায়। •

রাহুল গাঙ্গুলী ॥ কবি ও প্রাবন্ধিক

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

লেখা পাঠানোর নির্দেশনাবলি

ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা অবশ্যই এমএস ওয়ার্ড (SutonnyMJ)-তে কম্পোজ করে দিতে হবে। সঙ্গে চেকবইয়ের ভেতরের পাতার ছবি তুলে বা স্ক্যান করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তথ্যসমূহ ইংরেজিতে পূরণ করে ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠান। অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। – সম্পাদক

ভারতীয় হাই কমিশন প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২। ই-মেইল: inf2.dhaka@mea.gov.in

Name :..... Pen Name :.....

Address :..... Bank Account Name :.....

..... Account No :.....

..... Bank Name :.....

Phone/Mobile :..... Branch Name :.....

e-mail :..... Routing No :.....

হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব জিয়াউল হাসান ও বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (বিওআরআই) মহাপরিচালক জনাব মাইনুল ইসলাম তিতাস ২০ জুন ২০২৩-এ বিওআরআই থেকে নির্বাচিত তরুণ বিজ্ঞানী জনাব শিমুল ভূঁইয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যিনি জলবায়ু পরিবর্তন ও বর্ষাবিষয়ক অধ্যয়নের লক্ষ্যে একটি গবেষণামূলক সমুদ্রভ্রমণে যোগদানের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিফ অব আর্মি স্টাফ COAS, জেনারেল মনোজ পান্ডে ০৬ জুন, ২০২৩-এ জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে, হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ০৫ জুন, ২০২৩-এ ভারতীয় হাই কমিশনের কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণকে মিশন লাইফ শপথবাক্য পাঠ করান।

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, June, 2023

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি
হাউজ নং : ২৪, রোড নং : ০২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
টেলিফোন : +৮৮০২৯৬১২৩২২, ইমেইল : lib.dhaka@mea.gov.in

লাইব্রেরি সময় : রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার ॥ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিনিট

লাইব্রেরি মেম্বারশিপ ফরম : www.hcidhaka.gov.in/pdf/membershipapplicationform-292018.pdf

ভারতীয় ভিসা আবেদনকারীদের জন্য জ্ঞাতব্য

ভারতীয় হাই কমিশন ও ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো এজেন্টের সম্পর্ক নেই।
ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে কোনো ভিসা ফি নেয় না।
ভিসা আবেদন কেন্দ্র ভিসা প্রসেসিং ফি হিসেবে মাত্র ৮০০ টাকা নিয়ে থাকে।

আবেদন করার আগে দয়া করে এই তথ্যগুলো সম্পর্কে সচেতন হোন।